দাওয়াত ও জিহাদ

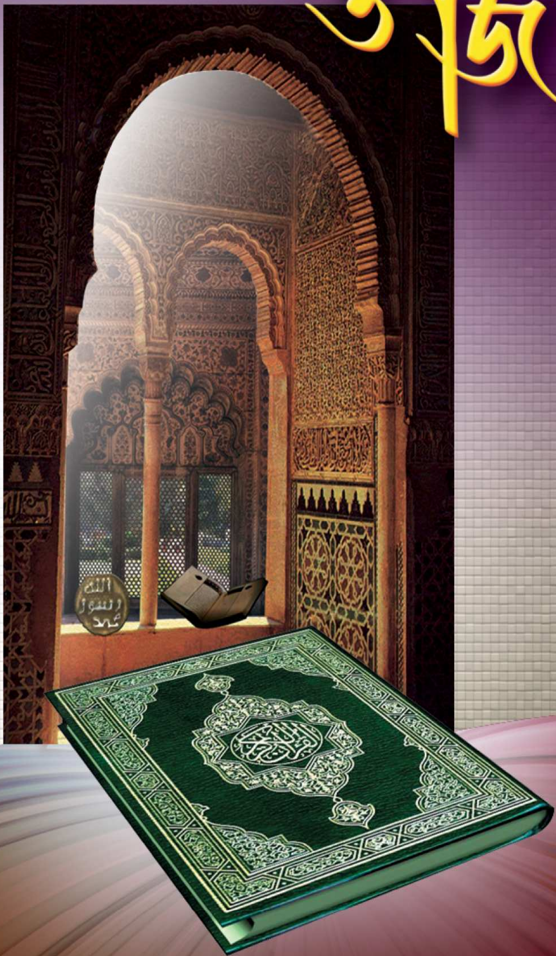

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

www.ahlehadeethbd.org

দাওয়াত ও জিহাদ

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

প্রকাশক
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী-৬২০৪
হা.ফা.বা. প্রকাশনা-১৪
ফোন ও ফ্যাক্স : ০৭২১-৮৬১৩৬৫

الدعوة و الجهاد

تأليف : د. محمد أسد الله الغالب

الناشر : حديث فاؤنديشن بنغلاديش

(مؤسسة الحديث للطباعة والنشر)

১ম প্রকাশ
১৯৯৩ 'যুবসংঘ' প্রকাশনী (বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ)
২য় সংস্করণ
১৪২৩হিঃ/২০০৩খৃঃ হা.ফা.বা. প্রকাশনী।
৩য় সংস্করণ
১৪৩২হিঃ/২০১০খৃঃ হা.ফা.বা. প্রকাশনী।

॥ সর্বস্বত্ব প্রকাশকের ॥

কম্পোজ
হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

মুদ্রণ
সোনালী প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং লিঃ, সপুরা, রাজশাহী।

নির্ধারিত মূল্য
১৫ (পনের) টাকা মাত্র।

DAWAT O JIHAD by **Dr. MUHAMMAD ASADULLAH AL-GHALIB**. Published by: **HADEETH FOUNDATION BANGLADESH**. H.F.B.14. Kajla, Rajshahi, Bangladesh. Ph & Fax : 88-0721-861365. **Fixed price**: Taka: 15 (fifteen) only.

সূচীপত্র

المحتويات

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	দাওয়াত ও জিহাদ	৪
২.	আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত	৮
৩.	বিপর্যয়ের কারণ	১০
৪.	হাদীছের কিতাব সমূহের আগমন	১১
৫.	তিনটি যুগ	১৪
৬.	অন্ধকারে আলো	১৬
৭.	নিকট অতীতের কয়েকজন মুজাহিদ	১৮
৮.	মুক্তির একই পথ	২৩
৯.	দাওয়াতের তিনটি স্তর	২৪
১০.	দাঈ-র জন্য অপরিহার্য একটি দায়িত্ব	২৬
১১.	হক ও বাতিল পন্থীদের চারটি স্তর	২৭
১২.	দাওয়াত না বিজয় সাধন?	২৮
১৩.	জিহাদ	৩০
১৪.	উপসংহার	৩৮

জীবনের চেয়ে দীপ্ত মৃত্যু তখনি জানি
শহীদী রক্তে হেসে ওঠে যবে যিন্দেগানী

بسم الله الرحمن الرحيم

দাওয়াত ও জিহাদ

[১৯৯১ সালের ২৫শে এপ্রিল বৃহস্পতিবার রাজশাহী মহানগরীর উপকণ্ঠে নওদাপাড়া আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর দক্ষিণ পার্শ্বস্থ ময়দানে অনুষ্ঠিত 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর দু'দিনব্যাপী ২য় জাতীয় সম্মেলন ও তাবলীগী ইজতেমায় সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও (তৎকালীন) কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা ও সুধী পরিষদের মাননীয় আমীর জনাব মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রদত্ত উদ্বোধনী ভাষণ]*

আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু
নাহমাদুহু ওয়া নুছাল্লী 'আলা রাসূলিহিল কারীম

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর জাতীয় সম্মেলন ১৯৯১ ও তাবলীগী ইজতেমার সম্মানিত সভাপতি, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ওলামায়ে কেরাম, সুধীমণ্ডলী, দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হ'তে আগত ভাই ও ভগিনীগণ এবং আহলেহাদীছ আন্দোলনের আগামী দিনের ভবিষ্যৎ তরুণ কর্মী ও সাথীবৃন্দ!

১৯৮০ সালের ৫ ও ৬ই এপ্রিল তারিখে বাংলাদেশের রাজধানী শহর ঢাকাতে অনুষ্ঠিত আহলেহাদীছ যুবসংঘের ১ম আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঐতিহাসিক জাতীয় সম্মেলনের দীর্ঘ এগার বছর পরে বাংলাদেশের সর্বাধিক আহলেহাদীছ অধ্যুষিত যেলা রাজশাহী শহরের উপকণ্ঠে আজকের অভূতপূর্ব সম্মেলনে মিলিত হ'তে পেরে আমরা সর্বপ্রথমে আল্লাহ্র শুকরিয়া জ্ঞাপন করে বলি 'আলহামদুলিল্লাহ'। এই স্থানেই ১৩৫৫ সালের ২৮শে ফালগুন মোতাবেক ১৯৪৯ সালের ১২ই মার্চ শনিবার 'নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলেহাদীছ'-এর ১ম কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছিল।[১] সেদিন সেই কনফারেন্স অনুষ্ঠানের মেযবানের গুরুদায়িত্ব

** বর্তমানে উক্ত স্থানের উপর দিয়ে রাজশাহী মহানগরী নওদাপাড়া বাইপাস (আমচত্বর) সড়ক নির্মিত হয়েছে -প্রকাশক।*

১. গৃহীত: এসতেকবালিয়া কমিটির চেয়ারম্যান জনাব আব্দুল হামীদের লিখিত অভিভাষণ এবং 'আহলেহাদীস পরিচিতি' পৃঃ ৪৪ ও ১১০; উক্ত অভিভাষণ থেকে জানা যায় যে, ঐ দিন কায়েদে আযম মোহাম্মাদ আলী জিন্নাহ্র (১৮৭৬-১৯৪৮খৃঃ) নামানুসারে নওদাপাড়ার নাম 'জিন্নাহ নগর' রাখা হয়। বর্তমানে উক্ত স্থানে হামীদপুর নওদাপাড়া পাইলট স্কুল, গার্লস স্কুল ও নওদাপাড়া বাজার জামে মসজিদ স্থাপিত হয়েছে।

পালন করেছিলেন নওদাপাড়া এলাকার আহলেহাদীছ জনগণ। আজও ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে’র ২য় জাতীয় সম্মেলন ও তাবলীগী ইজতেমার মেযবানের মহান দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে রাজশাহী ও নওদাপাড়া এলাকার ভাইগণ তাঁদের পুরানো ঐতিহ্য বজায় রেখেছেন- এজন্য তাঁদেরকে জানাই অসংখ্য মুবারকবাদ। আল্লাহ পাক যেন আমাদের সকলের এই খালেছ দ্বীনী খিদমত কবুল করেন এবং ইহকাল ও পরকালে সর্বোত্তম জাযা প্রদান করেন-আমীন!!

বন্ধুগণ! উদ্বোধনী ভাষণের শুরুতে আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি বাংলাদেশ অঞ্চলে আহলেহাদীছ আন্দোলনে জোয়ার সৃষ্টিকারী খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধ্ব হ’তে শতবর্ষ ব্যাপী পরিচালিত জিহাদ আন্দোলনের মহান নেতৃবৃন্দকে। আমি স্মরণ করি সম্ভবতঃ ১৮২২ সালে হজ্জের সফরে বাংলাদেশ অঞ্চলে পদার্পণকারী ইতিহাসের অমর নায়ক সাইয়িদ আহমদ ব্রেলভী *(১২০১-১২৪৬হিঃ/১৭৮৬-১৮৩১খৃঃ)* ও শাহ ইসমাঈল শহীদ *(১১৯৩-১২৪৬হিঃ/১৭৭৯-১৮৩১খৃঃ)*-এর নিকট থেকে আন্দোলনের দায়িত্ব লাভকারী মহান সংগঠক চাঁপাই নবাবগঞ্জের পাকা নারায়ণপুরের কৃতি সন্তান বহরমপুর জেলের বীর কয়েদী রফী মোল্লাকে ও তাঁর পাঁচজন মুজাহিদ শাগরিদ, পুত্র মৌঃ আমীরুদ্দীন নারায়ণপুরী, মৌঃ আসীরুদ্দীন নারায়ণপুরী, মৌঃ আব্দুল করীম বাসুদেবপুরী, মৌঃ আব্দুল কুদ্দূস মোল্লাটুলী ও মৌঃ ইব্‌রাহীম মণ্ডল দিলালপুরী প্রমুখ আহলেহাদীছ আন্দোলনের মহান পূর্বসূরীদেরকে। আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি জিহাদ আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্বের বীর সেনাপতি পাটনার মাওলানা এনায়েত আলীকে *(১২০৭-১২৭৪হিঃ/১৭৯২-১৮৫৮খৃঃ)*, যিনি দু’বারে প্রায় একযুগ ধরে বাংলাদেশের সাতক্ষীরা, যশোর, খুলনা এবং বিস্তীর্ণ বরেন্দ্র অঞ্চলে ও পশ্চিম বঙ্গের ২৪ পরগনা ও মালদহ অঞ্চলে ব্যাপক দাওয়াত ও জিহাদের প্রচার চালিয়ে শিরক ও বিদ‘আত অধ্যুষিত অত্র এলাকাসমূহে হেদায়াতের আলো জ্বেলে ছিলেন। যাঁর উত্তরসূরী হিসাবে পরবর্তীকালে আমীরুল মুজাহিদীন আমীর আব্দুল্লাহ্‌র (১২৭৮-১৩২০হিঃ/১৮৬২-১৯০২খৃঃ) নির্দেশক্রমে কুমিল্লার বুড়িচং উপযেলার পারুয়ারা গ্রামের মুজাহিদ সন্তান মাওলানা আকরাম আলী খান (১৮৫৫-১৯৩৭খৃঃ) বর্তমান পাকিস্তান ও আফগান সীমান্ত অঞ্চলের মূল মুজাহিদ কেন্দ্র ‘আসমাস্ত’ হ’তে রাজশাহীর দুয়ারীতে এসে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে জিহাদের অন্যতম কেন্দ্র গড়ে তোলেন, যা আজকের সম্মেলন স্থল হ’তে মাত্র তিন মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত।

আমরা স্মরণ করব মাওলানা এনায়েত আলীর অন্যতম খলীফা সপুরা মিয়াঁপাড়ার স্বনামধন্য নেতা ঝাবু সরদার ও ঝাগু সরদার নামক প্রভাবশালী দু'ভাইকে। যাঁদে র প্রচেষ্টায় রাজশাহীতে ৩৬ জাতির হিন্দু সবাই মুসলমান হয়ে যায় এবং রাজশাহী শহরে আহলেহাদীছ জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জিত হয়। যাঁর পুত্র মাওলানা গাযী মুনীরুদ্দীনের আমলে বর্তমান সপুরা সরকারী হাউজিং এষ্টেটের দখলীভুক্ত ২৪ বিঘা জমির উপরে বিরাট মাদরাসা বনাম মুজাহিদ ট্রেনিং ও রিক্রুটিং সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যাঁদের প্রতিষ্ঠিত জামে মসজিদটি এখন রাজশাহী ক্যান্টনমেন্টের অভ্যন্তরে পরিত্যক্ত মসজিদ হিসাবে বর্তমান আছে।[২]

আমরা স্মরণ করব মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভীর (১২২০-১৩২০হিঃ/১৮০৫-১৯০২খৃঃ) কীর্তিমান ছাত্র রাজশাহীর জামিরা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা কারামাতুল্লাহ ও তৎপুত্র মাওলানা মুহাম্মাদ ও তাঁদের সম-সাময়িক যমুনা পারের মৌলভী এলাহী বখ্‌শ শরীফপুরী (জামালপুর), মৌলভী নে'মাতুল্লাহ বর্ধমানী (চাপড়া, বাঘমারা, রাজশাহী), মৌলভী ইসহাক দৌলতপুরী (কুষ্টিয়া), মৌলভী আসীরুদ্দীন নদীয়াভী (মালদহ) প্রমুখ ওলামায়ে কেরামকে, যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং দাওয়াত ও তাবলীগের ফলে বৃহত্তর রাজশাহীর বিস্তীর্ণ এলাকায় আহলেহাদীছ আন্দোলন যোরদার হয় ও অগণিত মানুষ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী জীবন গড়ায় উদ্বুদ্ধ হন, *ফালিল্লা-হিল হাম্‌দ*। এছাড়াও স্মরণ করি বাংলার গ্রামে-গঞ্জের জানা-অজানা অসংখ্য মুজাহিদ, গাযী ও শহীদানকে, যাঁদের জান ও মালের অতুলনীয় ত্যাগের ফলেই এদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নির্ভেজাল ইসলামের এ মহান আন্দোলন।

অতঃপর আমরা শ্রদ্ধা নিবেদন করব 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র এককালের তরুণ ছাত্র কর্মী ঢাকার সাজ্জাদুল করীম ও টাংগাইলের আবুল কাসেম-এর প্রতি। ১৯৮০ সালের জুন মাসে কবরপূজার বিরুদ্ধে 'যুবসংঘে'র মিছিল নিয়ে যাওয়ার সময় কবর পূজারীদের হামলায় ঢাকার রাজপথে যাদের প্রথম রক্ত গড়িয়েছিল। আমরা শ্রদ্ধা জানাই কুমিল্লার 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সেই তরুণ তিনটি ভাইকে[৩], ১৯৮৯ সালের শেষ দিকে যারা চক্রান্তকারীদের হামলায় পিষ্ঠ

---

২. ১৯৯২ *সালের প্রথম দিকে ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। যার অনতিদূরে মাননীয় লেখক-এর উদ্যোগে তাঁর সংগঠন কর্তৃক* ১৯৯৪ *সালে আলীশান সপুরা মিয়াঁপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে -প্রকাশক।*

৩. *ফয়যুল ইসলাম (গোয়ালজুর, কানাইঘাট, সিলেট), রুস্তম আলী (জগৎপুর, কুমিল্লা), আব্দুল কবীর (ভৈষেরকুট, কুমিল্লা)। ঘটনাস্থল: দেবীদ্বার উপযেলাধীন ভৈষেরকুট প্রাইমারী স্কুলের*

হয়। ফয়যুল নামের ১৫ বছরের তরুণ ভাইটির মলদ্বার দিয়ে কুলু কুলু বেগে রক্ত প্রবাহিত হয় এবং হাসপাতালে ২৬ ঘণ্টা অজ্ঞান থেকে সাক্ষাৎ মৃত্যুর কোল থেকে ফিরে আসে। এমনিভাবে গত দু'বছরে অলস মস্তিষ্ক নেতাদের দ্বারা অপমানিত ও বিভিন্নমুখী নির্যাতনের শিকার হয়েছেন বা আজও হচ্ছেন, অথচ অসীম ধৈর্যের সাথে আহলেহাদীছ আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন, 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সেই সকল কর্মী ও উপদেষ্টা ভাইদের প্রতি রইল আমাদের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও অকৃত্রিম দো'আ। বিশেষ করে সাবেক কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা ও আজকের প্রধান অতিথি ভাই আব্দুল মতীন সালাফীর কথা বলতে আমাদের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে, যাঁকে এই সব তথাকথিত নেতাদের ষড়যন্ত্রে মাত্র তিন ঘণ্টার সরকারী নোটিশে বাংলাদেশ ছাড়তে বাধ্য করা হয়।[৪] আল্লাহ পাক যেন আমাদের সকল প্রকার ত্যাগ ও কুরবানীর উত্তম জাযা ইহকাল ও পরকালে দান করেন-আমীন!

পরিশেষে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি দেশের বিভিন্ন প্রান্ত হ'তে আগত 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ও 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা'র আন্দোলন পাগল ভাই-বোন ও তাদের শুভাকাংখী মুরব্বিয়ান ও অন্যান্য সুধী মণ্ডলীকে এবং শ্রদ্ধেয় ওলামায়ে কেরামকে, যাঁদের স্বতঃস্ফূর্ত আগমনে রাজশাহী মহানগরীর জনপদ আলোড়িত ও আমোদিত হয়েছে এবং বাংলাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনে নতুন জোয়ারের শুভ সূচনা ঘটেছে।

হে আল্লাহ! আমাদের প্রত্যেক ভাই ও বোনের নিঃস্বার্থ দ্বীনী খিদমত যা কেবলমাত্র তোমার সন্তুষ্টির জন্য নিবেদিত হয়েছে, তুমি তা কবুল কর এবং ইহকাল ও পরকালে জাযায়ে খায়ের আতা কর- আমীন! ইয়া রব্বাল 'আলামীন!!

সম্মুখে, ১৯৮৯ সালের শেষ দিকে। এরা তখন জগৎপুর মাদরাসার ছাত্র ও যুবসংঘের 'কর্মী' ছিল। উক্ত স্থানে তারা মাওলানা আবু তাহের বর্ধমানীর জালসায় ওয়ায শুনতে এসেছিল।

৪. *আব্দুল মতীন সালাফী (১৯৫৪-২০১০ খৃঃ) সঊদী সরকারের অধীনে চাকুরীরত মাবঊছ হিসাবে ১লা জানুয়ারী ১৯৮০ হ'তে ২রা জুলাই ১৯৮৯ পর্যন্ত ৯ বছর ৭ মাস ২ দিন বাংলাদেশে কর্মরত ছিলেন। এই সময় তিনি 'বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলেহাদীস'-এর কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য এবং 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের' কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ছিলেন। তাঁর জন্মস্থান ভারতের পশ্চিম বঙ্গের পশ্চিম দিনাজপুর যেলার করণদীঘি থানার অন্তর্গত ভুল্‌কী গ্রামে। বাংলাদেশ থেকে ফিরে গিয়ে বিহারের কিষাণগঞ্জ শহরের উপকণ্ঠে খাগড়া এলাকায় ছেলে ও মেয়েদের জন্য বিশাল দু'টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন এবং সমাজ কল্যাণে ব্যাপক অবদান রাখেন। ২০১০ সালের ১৬ই জানুয়ারী শনিবার কিষাণগঞ্জে নিজবাড়ীতে তিনি ৫৬ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন এবং নিজ গ্রাম ভুলকীতে সমাহিত হন। =দ্রঃ মাসিক আত-তাহরীক, রাজশাহী ১৩/৫ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী'১০।*

আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত

বন্ধুগণ!

হিন্দুস্থানে ইসলামের প্রথম আগমন ঘটেছে প্রধানতঃ দু'ভাবে। এক- আরব বণিক ও ওলামায়ে দ্বীনের দাওয়াতের মাধ্যমে এবং দুই- ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনে এযামের নেতৃত্বে সশস্ত্র জিহাদের মাধ্যমে।

ভূমধ্যসাগর হ'তে আরব সাগর হয়ে বঙ্গোপসাগরের বুক চিরে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ অতিক্রম করে আরব বণিকগণ সুদূর চীনদেশে বাণিজ্য করতেন। ইসলাম গ্রহণের পর সর্বপ্রথম তাদের মাধ্যমে এই দীর্ঘ সমুদ্র পথের কুলে কুলে অবস্থিত বাণিজ্য কেন্দ্র সমূহে ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটে। তাদের অনেকে এসব স্থানে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং কেউ কেউ স্থায়ী বসতি স্থাপন করে জীবন অতিবাহিত করেন। ইন্দোনেশিয়ার মশলাকেন্দ্র মালাক্কা, সুমাত্রা, জাভা প্রভৃতি অঞ্চলে আরব বণিকদের যাতায়াত ছিল খুব বেশী। বলা চলে মালাক্কা কেন্দ্র থেকেই ইসলাম আরব বণিকদের মাধ্যমে সমস্ত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। অত্র অঞ্চলের বৌদ্ধরা ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে দলে দলে মুসলমান হয়ে যায়। ফলে কোনরূপ সামরিক অভিযান ছাড়াই ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও ফিলিপাইনের মিন্দানাঁও প্রভৃতি এলাকায় ইসলাম বিজয় লাভ করে। বর্তমানে ইন্দোনেশিয়া পৃথিবীর সর্ববৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র। এ অঞ্চলের মুসলমানগণ 'শাফেঈ' বলে খ্যাত। তবে তাদেরকে 'আহলেহাদীছ' বলাই শ্রেয়। একই যাত্রাপথে আরব বণিকগণ মাঝে-মধ্যে চট্টগ্রাম বন্দরেও আসতেন। যা তখনকার দিনে তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ বন্দর ছিল না। জাহাজ ডুবির কারণে বা অন্যান্য কারণে তারা চট্টগ্রাম এলাকায় নিজেদের মধ্যকার নির্বাচিত সুলতানের দ্বারা স্বশাসিত কিছু এলাকাও সৃষ্টি করেছিলেন। এখনও চট্টগ্রাম অঞ্চলের বহু লোকের চেহারার সঙ্গে আরবদের চেহারার অনেক সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। ঐ এলাকার লোকদের ভাষায় আরবী ফার্সী শব্দের আধিক্য, আলেম-ওলামার সংখ্যাধিক্য, নারীদের কড়া পর্দাপ্রথা ইত্যাদি তাদের প্রাচীন আরব রক্তের ছিটেফোঁটা স্বভাব হিসাবে ধরে নেওয়া যায়। মুস্তাদরাকে হাকেম হাদীছ গ্রন্থের[৫] বর্ণনামতে হিন্দের (বাংলার) শাসক রাহ্মী বংশের জনৈক রাজা আরবদেশে শেষনবীর আগমনের সংবাদে খুশী হয়ে আরব বণিকদের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দরবারে এক কলস আদা (زنجبيل) উপঢৌকন হিসাবে পাঠিয়েছিলেন। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) খুশী হয়ে তা নিজে খেয়েছিলেন এবং ছাহাবায়ে কেরামের মধ্যে টুকরা টুকরা

---

৫. মুস্তাদরাকে হাকেম ৪/১৩৫ পৃঃ; আল-ইক্বদুছ ছামীন পৃঃ ২৪; থিসিস পৃঃ ৪২৫ টীকা-২।

করে বণ্টন করেছিলেন'। অনেক বিদ্বান বর্তমান কক্সবাজার জেলার রামু উপযেলাকে প্রাচীন রাহ্মী রাজাদের স্মৃতিবাহী এলাকা বলে সম্ভাবনা ব্যক্ত করে থাকেন।

পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের রাজধানী করাচীকে যেমন আমরা উপমহাদেশীয় বিচারে 'বাবুল ইসলাম' বা ইসলামের দ্বার বলি। যেমনভাবে মক্কা থেকে মুহাদ্দিছগণের আগমন ও অবতরণস্থল হিসাবে দক্ষিণ ভারতের গুজরাটকে 'বাব মক্কা' বা মক্কার দ্বার বলা হয়, তেমনিভাবে আমরা বঙ্গোপসাগর তীরবর্তী চট্টগ্রাম বন্দরকে বাংলাদেশের জন্য 'বাবুল ইসলাম' বা ইসলামের দ্বার বলতে পারি।

বন্ধুগণ!

আরব বণিকদের মাধ্যমে ও তাঁদের সাথে বিভিন্ন সময়ে আগত ওলামায়ে দ্বীনের মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রথম যে ইসলাম প্রচারিত হয়েছিল তা ছিল অবিমিশ্র ও নির্ভেজাল ইসলাম। সেখানে কোন শির্ক ও বিদ'আত ছিল না, ছিল না বাতিল রায় ও ক্বিয়াসের ছড়াছড়ি, ছিল না কোনরূপ মাযহাবী দলাদলি, ছিল না কোন তরীক্বা ও পীর মুরীদীর ভাগাভাগি। প্রতিটি ধর্মীয় ব্যাপারেই তাঁরা সরাসরি হাদীছ থেকে সমাধান তালাশ করার চেষ্টা করতেন। যার প্রভাব আমরা আজও ভুলতে পারিনি। এখনও কোন বস্তুর সন্ধান না পেলে আমরা বলি 'জিনিসটির হদিস পাওয়া গেল না'। সম্ভবতঃ প্রতিবেশী ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার বৌদ্ধদের দলে দলে ইসলাম গ্রহণের প্রভাবে অথবা স্থানীয় হিন্দু ব্রাহ্মণদের নিষ্ঠুর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে এবং পাশাপাশি ইসলামের বিরল সাম্যের বাণী ও মুসলমানদের চরিত্র মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ বৌদ্ধ জনসাধারণ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকেন। ফলে ইখতিয়ারুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক ৬০২ হিজরী মোতাবেক ১২০৬ খৃষ্টাব্দে অত্যাচারী ব্রাহ্মণ রাজা লক্ষ্মণ সেনের কাছ থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়ার সময় বাংলাদেশে অগণিত মুসলমানদের বসবাস ছিল, ছিল ইসলামের পক্ষে ব্যাপক গণ সমর্থন।

এই সামরিক ও রাজনৈতিক বিজয়ের ফলে এতদঞ্চলে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাক বা না পাক তাদের আক্বীদা ও আমলে ঘটতে শুরু করল এক ব্যাপক ও সুদূর প্রসারী বিপর্যয়, যা ইন্দোনেশিয়াতে ঘটেনি, ঘটেনি অসংখ্য মুহাদ্দিছের আগমনে ধন্য গুজরাট, মালাবার তথা দক্ষিণ ভারতের মুসলমানদের আক্বীদা ও আমলে। আমরা এক্ষণে সে বিষয়ে কিছুটা আলোকপাত করব।

বিপর্যয়ের কারণ :

৬০২ হিজরী মোতাবেক ১২০৬ খৃষ্টাব্দে আফগান বিজেতা শিহাবুদ্দীন মুহাম্মাদ ঘোরী (১১৮৬-১২০৬ খৃঃ) কর্তৃক দিল্লী জয় ও একই সময়ে তাঁর তুর্কী গোলাম ও সেনাপতি ইখতিয়ারুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক বাংলা জয়ের ফলে উত্তর ও পূর্ব ভারতের বিশাল এলাকায় মুসলমানদের সামরিক ও রাজনৈতিক বিজয়াভিযান শুরু হয়। বখতিয়ার খিলজীসহ উপমহাদেশে যে সকল বিজেতা সামরিক নেতার আগমন ঘটে, তাঁদের মধ্যে আলপ্তগীন, সবুক্তগীন, কুতুবুদ্দীন আইবেক, ইলতুত্মিশ প্রমুখ সকলেই ছিলেন নও মুসলিম অনারব তুর্কী গোলাম ও মাযহাবের দিক দিয়ে 'হানাফী'। পরবর্তীতে নও মুসলিম মোগল শাসকরাও ছিলেন তুর্কীদেরই একটি শাখা। এঁরা বিজেতা হ'লেও ইসলামের প্রকৃত নমুনা ছিলেন না। তাঁদের শাসন ব্যবস্থাও ইসলামী ছিল না। তাঁদের সঙ্গে আসা ভাগ্যান্বেষী পীর-ফকীরদের ত্যাগী চরিত্র ও অভিনব প্রচার কৌশলে এদেশের বহুলোক মুসলমান হয়ে যায়। কিন্তু এসব বিজেতাদের এবং তাঁদের অনুসরণীয় ছূফী ও দরবেশদের মাধ্যমে যে ইসলাম এ দেশে প্রচারিত হয়, তা ছিল মূল আরবীয় ইসলাম হ'তে অনেক দূরে। এখানে রায় ও ক্বিয়াসের বাড়াবাড়ি ছিল, ছিল পীরপূজা, কবরপূজা সহ নানাবিধ শিরক ও বিদ'আতের ছড়াছড়ি। আলেমদের প্রচারিত বিদ'আতে হাসানাহ্র সুযোগে এখানে অনুপ্রবেশ ঘটে প্রতিবেশী হিন্দু ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির বহু কিছু অনুষ্ঠান ইসলামের লেবাস পরিধান করে। ফলে বখতিয়ার খিলজীর সামরিক বিজয়ের প্রায় পৌনে ৬০০ বছর পূর্ব থেকে বাংলাদেশের মুসলমান যে মূল ও অবিমিশ্র আরবীয় ইসলামে অভ্যস্ত ছিল, তা থেকে তারা ক্রমেই দূরে সরে যেতে থাকে এবং ছূফীদের ও শাসকদের চালু করা বিকৃত ইসলামকে যথার্থ ইসলাম ভাবতে শুরু করে। যদিও ব্যতিক্রম সে যুগেও ছিল, এ যুগেও আছে।

দক্ষিণ ভারতীয় উপকূল ও ইন্দোনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জে ইসলামের বিকৃতি কম ছিল। পক্ষান্তরে দিল্লী হ'তে বাংলা পর্যন্ত বিশাল উত্তর ও পূর্বভারতীয় এলাকায় প্রধানতঃ তুর্কী, আফগান ও মোগল শাসনের পৃষ্ঠপোষকতা ও তাদের আমলে মাযহাবী আলেমদের দুঃখজনক অনুদারতা, ইসলামী শিক্ষা সিলেবাসে কুরআনের তাফসীর ও ইলমে হাদীছের বদলে মাযহাবী ফিক্বহ, মানতেক-ফালসাফা, ইলমে কালাম তথা তর্কশাস্ত্র ও মা'কূলাতের কেতাবসমূহ সিলেবাসভুক্ত করণ, সরকারী চাকুরীতে হানাফী ফিক্বহে দক্ষতা অর্জনের শর্তারোপ ও আহলেহাদীছ আলেমদের সংখ্যাল্পতার কারণে কুরআন ও হাদীছের নির্ভেজাল ইসলাম শাব্দিক অর্থেই সাধারণ জনগণের নাগালের বাইরে থেকে যায়

বলা চলে। দ্বাদশ শতাব্দী হিজরীতে শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (১১১৪-১১৭৬ হিঃ/১৭০৩-১৭৬২ খৃঃ)-এর সময়কাল পর্যন্ত কুরআনের তরজমা 'গুনাহে কবীরা' বলে গণ্য করা হ'ত। আজ থেকে পৌনে দু'শ বছর আগে শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিছ দেহলভী (১১৫৯-১২৩৯ হিঃ/১৭৪৭-১৮২৪ খৃঃ)-এর মাদরাসায় সেই সময়ে মাত্র দু'খানা বুখারী শরীফ ছিল। যার ছিন্নপত্র সমূহ পাঠদানের সময় ছাত্রদের নিকটে সরবরাহ করা করা হ'ত। অতঃপর পাঠদান শেষে জমা নেওয়া হ'ত। দিল্লীর যে মাদরাসা রহীমিয়াহ ছিল তৎকালীন ভারতের শ্রেষ্ঠ ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র, তার অবস্থা যদি এই হয়, তাহ'লে ভারতের অন্যান্য এলাকার অবস্থা কেমন ছিল তা সহজেই অনুমেয়। ভারতের মুসলমানেরা কি কারণে হাদীছের ইলম থেকে দূরে ছিল, নিম্নের সময়চিত্র দ্বারা কিছুটা অনুধাবন করা যাবে।

হাদীছের কিতাবসমূহের আগমন :

১. হাদীছের কিতাব সমূহের মধ্যে ভারতে সর্বপ্রথম যে কিতাবের আগমন ঘটে, তার নাম **'মাশারেকুল আন্ওয়ার'**। ইমাম রাযিউদ্দীন হাসান বিন মুহাম্মাদ ছাগানী লাহোরী (৫৭৭-৬৫০ হিঃ/১১৮১-১২৫২ খৃঃ) কর্তৃক ছহীহ বুখারী ও মুসলিম হ'তে চয়নকৃত ২২৫৩ টি ক্বওলী হাদীছের এই গুরুত্বপূর্ণ সংকলনটি সপ্তম শতাব্দী হিজরীর মধ্যবর্তী সময়ে দিল্লীতে আসে। নিযামুদ্দীন আউলিয়া (৬৩৪-৭২৫হিঃ/১২৩৬-১৩২৫খৃঃ) এই সংকলনটি মুখস্থ করেন। অষ্টম শতাব্দী হিজরীতে মুহাম্মাদ তুগলকের সময়ে (৭২৫-৭৫২হিঃ/১২৩৫-১৩৫২খৃঃ) দিল্লীতে এই সংকলনটির মাত্র একটি কপি মওজুদ ছিল।

২. ছহীহ বুখারী ও মুসলিম : সপ্তম শতাব্দী হিজরীর শেষ দিকে সর্বপ্রথম আল্লামা শারফুদ্দীন আবু তাওয়ামা বুখারী (মৃঃ ৭০০/১৩০০খৃঃ) কর্তৃক বাংলাদেশের তৎকালীন রাজধানী সোনারগাঁয়ে আনা হয়। তিনিই সর্বপ্রথম উত্তর-পূর্ব ভারতীয় অঞ্চলে বুখারী ও মুসলিমের দরস দেন এবং দীর্ঘ ২২ বছর যাবত সোনারগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্বা-লাল্লাহু ও ক্বা-লার রাসূলের অমিয় সুধা পান করিয়ে বাংলা, বিহার ও আশপাশের অগণিত জ্ঞানপিপাসু মানুষকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী জীবন গড়ায় উদ্বুদ্ধ করেন। তাঁর মৃত্যুর পরে বার ভূঁইয়াদের রাজত্বকাল(৯০০-৯৪৫/১৪৯২-১৫৩৮খৃঃ) পর্যন্ত প্রায় আড়াইশত বৎসর সোনারগাঁও ইলমে হাদীছের মারকায বা কেন্দ্র হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিল। এই সময় বাংলার সুলতান আলাউদ্দীন হুসাইন শাহ (৯০০-৯২৪/১৪৯৩-১৫১৮খৃঃ)

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করার সাথে সাথে ইলমে কুরআন ও ইলমে হাদীছের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি ৯০৭ হিজরীর ১লা রামাযান মোতাবেক ১৫০২ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে মালদহ যেলার গৌড় ও পাণ্ডুয়াতে বড় ধরনের দু'টি মাদরাসা কায়েম করেন এবং সিলেবাসে ইলমে হাদীছকে অবশ্যপাঠ্য করে দেন। রাজধানী একডালার (বর্তমানে ভারতের পশ্চিম দিনাজপুর অঞ্চলে) জন্য বুখারী তিন খণ্ডে সংকলন করেন। বিভিন্ন দেশ থেকে মুহাদ্দিছগণকে তিনি রাজধানী একডালাতে সমবেত করেন। ইলমে হাদীছের প্রতি এই পৃষ্ঠপোষকতার জন্য তাঁকে সমসাময়িক দক্ষিণ ভারতের গুজরাট রাজ্যের মুযাফফরশাহী সালত্বানাতের (৮৬৩-৯৮০হিঃ/১৪৫৮-১৫৭২খৃঃ) সঙ্গে তুলনা করা হয়।

যাই হোক মুহাদ্দিছ শারফুদ্দীন আবু তাওয়ামা ও তাঁর পরবর্তী হাদীছ পিপাসু ছাত্র ও শাসকদের প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের মানুষ পুনরায় তাদের হারানো ঐতিহ্য তথা হাদীছ অনুযায়ী আমলের জাযবা ফিরে পায়। এজন্যই যথার্থভাবে বলা চলে যে, উত্তর ও পূর্বভারতীয় উপমহাদেশে ছহীহায়নের প্রথম শিক্ষাদাতা হিসাবে বাংলাদেশ সত্যিই একটি গৌরবধন্য দেশ। *ফালিল্লা-হিল হাম্দ*।

৩. মাছাবীহ : ইমাম মুহিউস সুন্নাহ আবু মুহাম্মাদ হুসায়েন বিন মাস'ঊদ আল-বাগাভী (মৃঃ ৫১৬হিঃ) সংকলিত 'মাছাবীহুস সুন্নাহ' ৮ম শতাব্দী হিজরীর মধ্যভাগে হিন্দুস্থানে আসে।

৪. মিশকাত : অমনিভাবে ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আল-খত্বীব তাবরেযী (মৃঃ ৭৩৯হিঃ) সম্পাদিত 'মিশকাতুল মাছাবীহ' ৯ম শতাব্দী হিজরীর প্রথম দিকে জৌনপুর কুতুবখানায় আসে।

৫. সুনানে আরবা'আহ : নাসাঈ, আবুদাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ এবং সুনানে বায়হাক্বী, মুস্তাদরাকে হাকেম প্রভৃতি হাদীছ গ্রন্থ ৯ম শতাব্দী হিজরীতে বিহারের খ্যাতনামা মনীষী সোনারগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র ও শারফুদ্দীন আবু তাওয়ামার জামাতা আল্লামা শারফুদ্দীন আহমাদ বিন ইয়াহ্ইয়া মুনীরী (৬৬১-৭৮২হিঃ/১২৬০-১৩৮১খৃঃ) হেজায থেকে আনিয়ে নেন।

উপরোক্ত আলোচনায় বুঝা গেল যে, ৭ম শতাব্দী হ'তে ৯ম শতাব্দী হিজরী সময়কালের মধ্যেই উত্তর ও পূর্বভারতে সর্বপ্রথম প্রচলিত হাদীছ গ্রন্থ সমূহের আগমন ঘটে। কিন্তু ছাপার ব্যবস্থা না থাকায়, সরকারী চাকুরীতে এসবের কোন প্রয়োজন না হওয়ায়, শিক্ষার সিলেবাসে তাফসীর ও হাদীছ না থাকায় এবং আহলেহাদীছ আলেমদের সংখ্যাল্পতা ও সর্বোপরি রাজনৈতিক অনুদারতার

কারণে এতদঞ্চলের মুসলমানগণ কুরআন ও হাদীছের মূল ইসলাম হ'তে অনেক দূরে চলে যায়। এসব গ্রন্থাবলীর দু'একটি হস্তলিখিত কপি বিশেষ বিশেষ আহলেহাদীছ আলেমদের নিকটেই মাত্র পাওয়া যেত, যা ছিল সাধারণের নাগালের বাইরে। ফলে 'পপুলার' (Popular) ও রেওয়াজী ইসলামকেই মানুষ প্রকৃত ইসলাম ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে এবং এর বিরোধী কিছু দেখলেই তার বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হয়ে উঠতে থাকে। যেমন বিখ্যাত সাধক ও মাশারেকুল আনওয়ার হাদীছ গ্রন্থের হাফেয শায়খ নিযামুদ্দীন আউলিয়া (৬৩৪-৭২৫হিঃ/১২৩৬-১৩২৫খৃঃ) যখন সুলতান গিয়াছুদ্দীন তুগলকের সময়ে (১৩২০-১৩২৫খৃঃ) দিল্লীর সেরা আলেমদের সঙ্গে একটি মাসআলায় হাদীছ দ্বারা জওয়াব দিতে থাকেন, তখন তারা পরিষ্কার বলে দেন যে,

هند مین فقهی روایات کی قانونی حیثیت خود احادیث سے بهی زیاده هے، آپ ابو حنیفه کی رائے پیش کیجئے -

'ভারতীয় ইসলামী আইনশাস্ত্রে হাদীছের চাইতে ফিক্বহের গুরুত্ব অধিক। অতএব আপনি হাদীছ বাদ দিয়ে আবু হানীফার রায় পেশ করুন'। তৎকালীন ভারতবর্ষের সেরা ফক্বীহদের এই আচরণ দেখে শায়খ নিযামুদ্দীন আউলিয়া এই বলে দুঃখ করে দরবার থেকে বেরিয়ে এলেন যে,

ایسے ملك میں مسلمان کب تك باقی رهینگے جهاں ایك فرد کی رائے کو احادیث پر فوقیت دیجاتی هے ؟

'ঐ দেশের মুসলমান কতক্ষণ টিকে থাকতে পারে, যে দেশে একজন ব্যক্তির রায়কে হাদীছের উপরে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়ে থাকে?' আলাউদ্দীন খিলজীর সময়ে (৬৯৫-৭১৫হিঃ/১২৯৬-১৩১৬খৃঃ) খ্যাতনামা মিসরী মুহাদ্দিছ শামসুদ্দীন তুর্ক হাদীছের কিতাব সমূহ নিয়ে ভারতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন। কিন্তু মুলতানে এসে জানতে পারেন যে, আলাউদ্দীন খিলজী ছালাতে অভ্যস্ত নন এবং তাঁর শাসনাধীনে ভারতীয় ইসলামী শিক্ষার সিলেবাসে ইলমে হাদীছকে বাদ দিয়ে স্রেফ হানাফী ফিক্বহ চালু রাখা হয়েছে। তিনি দুঃখ করে আলাউদ্দীন খিলজীকে একটি চিঠি পাঠিয়ে মুলতান থেকে মিসরে ফিরে গেলেন। ঐ সময়ে ভারতের ৪৬ জন সেরা আলেমের মধ্যে শামসুদ্দীন ইয়াহ্ইয়া (মৃঃ ৭৪৭হিঃ/১৩৪৬খৃঃ) নামক মাত্র একজন আলেমের মধ্যে ইলমে হাদীছের প্রতি কিছুটা আগ্রহ ছিল। শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (১১১৪-১১৭৬হিঃ/১৭০৩-১৭৬২খৃঃ) যখন কুরআনের প্রথম ফারসী তরজমা 'ফাৎহুর রহমান' লেখেন, তখন দিল্লীর আলেমরা কুরআন বিকৃতির ধুয়া তুলে তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র

করেন। শায়খ নিযামুদ্দীন আউলিয়া ও শাহ অলিউল্লাহ্র বিরুদ্ধে রায় ও মাযহাবপন্থী আলেমদের যে দুঃসাহস আমরা দেখেছি, তা কেবল সে যুগের জন্যই সীমাবদ্ধ নয়, আজও যাঁরা বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন দেশে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে ইসলামী আইন ও শাসন ব্যবস্থা কায়েমের প্রচেষ্টায় রত আছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে ইসলামের নামে এই দুষ্ট প্রকৃতির আলেমরা ও তাদের অন্ধভক্তরা সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে আছে।

তিনটি যুগ

উপমাহাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনকে আমরা তিনটি প্রধান যুগে বিভক্ত করতে পারি: প্রাথমিক যুগ (২৩-৩৭৫হিঃ), অবক্ষয় যুগ (৩৭৫-১১১৪হিঃ) ও আধুনিক যুগ (১১১৪হিঃ থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত)।

১. প্রাথমিক বা স্বর্ণযুগ : যা ২৩ হিজরী থেকে ৩৭৫ হিজরী (৬৪৩-৯৮৫খৃঃ) পর্যন্ত ব্যাপ্ত। এই যুগে উমাইয়া খেলাফতের শেষ (১৩২হিঃ/৭৫০খৃঃ) পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে ১৮ বা ২৫ জন ছাহাবীসহ ২৪৫ জন তাবেঈ ও তাবে তাবেঈ হিন্দুস্থানে আগমন করেন। সর্বশেষ ছাহাবী সিনান বিন সালামাহ আল-হুযালী ৪৮ হ'তে ৫৩ হিজরী পর্যন্ত দামেস্কের উমাইয়া খলীফার পক্ষ হ'তে সিন্ধুর গভর্ণর ছিলেন। তিনি বেলুচিস্তানে শাহাদাত বরণ করেন। হাফেয ইবনু কাছীর (৭০১-৭৭৪হিঃ) বলেন,

وَكَانَ فِيْ عَسَاكِرِ بَنِيْ أُمَيَّةَ وَجُيُوْشِهِمْ فِى الْغَزْوِ الصَّالِحُوْنَ وَالأَوْلِيَاءُ وَالْعُلَمَــاءُ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِيْنَ، فِيْ كُلِّ جَيْشٍ مِّنْهُمْ شَرْذِمَةٌ عَظِيْمَةٌ يَنْصُرُ اللهُ بِهِمْ دِيْنَهُ –

'উমাইয়া যুগে প্রত্যেক জিহাদী কাফেলার সাথে নেককার ও সাধু ব্যক্তিগণ এবং উঁচুদরের তাবেঈ বিদ্বানগণের একটি বিরাট দল থাকতেন, যাঁদের মাধ্যমে আল্লাহ পাক তাঁর দ্বীনকে সাহায্য করেছেন'।[৬] তাঁদের দাওয়াত ও তাবলীগে সিন্ধু এলাকায় মুসলিম জনসংখ্যা এত বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, ৯৩ হিজরী মোতাবেক ৭১২ খৃষ্টাব্দে মুহাম্মাদ বিন ক্বাসিম যখন সিন্ধু জয়ে আসেন, তখন কেবলমাত্র মুলতানের মুসলমানদের নিরাপত্তার জন্য তাঁকে সেখানে ৫০,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য মোতায়েন করতে হয়। জেরুযালেমের বিখ্যাত মুসলিম ভূ-পর্যটক শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বেশারী আল-মাক্বদেসী পৃথিবীর বিভিন্ন

---

৬. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৯/৯৩ পৃঃ 'সমরকন্দ বিজয়' অনুচ্ছেদ।

মুসলিম এলাকা ভ্রমণ শেষে ৩৭৫ হিজরী মোতাবেক ৯৮৫ খৃষ্টাব্দে যখন ভারতবর্ষের তৎকালীন ইসলামী রাজধানী বর্তমান করাচীর সন্নিকটবর্তী সিন্ধুর মানছূরাতে এলেন, তখন সেখানকার মুসলমানদের 'মাযহাব' বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি স্বীয় ভ্রমণগ্রন্থে বলেন,

أَكْثَرُهُمْ أَصْـحَابُ حَـدِيْثٍ– *'আকছারুহুম আছহা-বু হাদীছিন'* অর্থাৎ 'তাদের অধিকাংশ অধিবাসী হ'লেন আহলেহাদীছ'।[৭] বলা আবশ্যক যে, মাক্বদেসী নিজে ছিলেন 'হানাফী'। শুধু সিন্ধু বা ভারতবর্ষ নয়, ঐ সময় পৃথিবীর অন্যান্য মুসলিম এলাকাতেও আহলেহাদীছ জনসংখ্যার আধিক্য ছিল। যেমন ইরাকের খ্যাতনামা ঐতিহাসিক আবু মানছূর আব্দুল ক্বাহির বাগদাদী (মৃঃ ৪২৯ হিঃ) মাক্বদেসীর প্রায় ৫০ বৎসর পরে তৎকালীন ইসলামী দুনিয়ায় আহলেহাদীছগণের অবস্থান সম্পর্কে বলেন,

ثُغُوْرُ الرُّوْمِ وَالْجَزِيْرَةِ وَثُغُوْرُ الشَّامِ وَثُغُوْرُ آذَرْبَيْجَانَ وَبَابُ الْأَبْوَابِ كُلُّهُمْ عَلَي مَذْهَبِ أَهْلِ الْحَدِيْثِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَكَذَالِكَ ثُغُوْرُ أَفْرِيْقِيَّةَ وَأَنْدَلُسَ وَكُلُّ ثغَـرِ وَرَاءِ بَحْرِ الْمَغْرِبِ أَهْلُهُ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيْثِ وَكَذَالِكَ ثُغُوْرُ الْيَمَنِ عَلَي سَاحِلِ الزَّنْجِ وَأَمَّا ثُغُوْرُ أَهْلِ مَا وَرَاءِ النَّهْرِ فِيْ وُجُوْهِ التُّرْكِ وَالصِّيْنِ فَهُمْ فَرِيْقَانِ: إِمَّـا شَافِعِيَّةٌ وَإِمَّا مِنْ أَصْحَابِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ–

'রূম সীমান্ত, আলজেরিয়া, সিরিয়া, আযারবাইজান, বাবুল আবওয়াব বা মধ্য তুর্কিস্থান প্রভৃতি এলাকার সকল মুসলিম 'আহলেহাদীছ' ছিলেন। অমনিভাবে আফ্রিকা, স্পেন ও পশ্চিম সাগরের পশ্চাদবর্তী দেশ সমূহের সমুদয় মুসলিম 'আহলেহাদীছ' ছিলেন। একইভাবে ইথিওপিয়ার উপকূলবর্তী ইয়ামন সীমান্তের সকল অধিবাসী 'আহলেহাদীছ' ছিলেন। অবশ্য তুর্কিস্থান ও চীন অভিমুখী নহরপার এলাকার মুসলমানেরা দু'দলে বিভক্ত ছিল। একদল শাফেঈ ও একদল হানাফী'।[৮] লক্ষণীয় যে, মাক্বদেসীর ন্যায় আব্দুল ক্বাহির বাগদাদীও এখানে হানাফী ও শাফেঈদের থেকে পৃথকভাবে 'আহলেহাদীছ'-এর বর্ণনা দিয়েছেন।

৭. *আহসানুত তাক্বাসীম ৪৮১ পৃঃ।*
৮. *কিতাবু উছূলিদ্দীন ১/৩১৭ পৃঃ।*

www.ahlehadeethbd.org

২. অবক্ষয় যুগ : ৩৭৫ হিজরী হ'তে ১১১৪ হিজরী (৯৮৫-১৭০৩খৃঃ) পর্যন্ত প্রায় সোয়া ৭ শত বৎসর পর্যন্ত ব্যপ্ত। এই যুগে ইলমে হাদীছ ও আহলেহাদীছ আন্দোলনের উপরে নেমে আসে অত্যাচার, নির্যাতন ও রাজনৈতিক অনুদারতার এক দীর্ঘ বিভীষিকাপূর্ণ গাঢ় অমানিশা। ৩৭৫ হিজরীর পর পরই সিন্ধুর মানছূরার শাসন ক্ষমতা আহলেহাদীছদের নিকট হ'তে কট্টর হিংসুক ইসমাঈলী শী'আরা ছিনিয়ে নেয়। তারা মুলতানের জামে মসজিদ বন্ধ করে দেয়। সমস্ত সুন্নী ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে দেয়। মুহাদ্দিছগণকে সিন্ধু থেকে বের করে দেয়। ইলমে হাদীছ শিক্ষার জন্য দেশের বাইরে মক্কা, মদীনা প্রভৃতি স্থানে যাওয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। যদিও পরবর্তীতে মুহাম্মাদ ঘোরী এই এলাকা জয় করেন ও তাঁর প্রতিনিধি নাছীরুদ্দীন কোবাচা এই এলাকা শাসন করেন। কিন্তু অষ্টম শতাব্দী হিজরীর মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত এখানে ইসমাঈলী সামারু শী'আদের আধিপত্য বজায় ছিল।

অন্যদিকে ৬০২ হিজরী মোতাবেক ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে আফগান নেতা মু'ইয্যুদ্দীন ওরফে শিহাবুদ্দীন মুহাম্মাদ ঘোরীর মাধ্যমে দিল্লীতে ও বখতিয়ার খিলজীর মাধ্যমে বাংলাদেশে 'আহলুর রায়' হানাফী শাসন কায়েম হয়। যাদের হাদীছ বিদ্বেষ ও মাযহাব প্রীতির কথা আমরা ইতিপূর্বে দেখে এসেছি। তখন থেকেই সিন্ধু হ'তে বাংলা পর্যন্ত কখনও তুর্কী কখনও গযনবী, কখনও আফগান ও কখনো মোগলদের দ্বারা উপমহাদেশ শাসিত হয় এবং মূল আরবীয় ইসলামী শাসন থেকে উপমহাদেশ চিরবঞ্চিত হয়। ফলে একদিকে রাজনৈতিক অনুদারতা, অন্যদিকে তাক্বলীদপন্থী আলেমদের সংকীর্ণতা, জনসাধারণের অজ্ঞতা ও আহলেহাদীছ আলেমদের স্বল্পতার কারণে আহলেহাদীছ আন্দোলন ভারতবর্ষে স্তিমিত হয়ে পড়ে। তবু এই সর্বব্যাপী অন্ধকারের মধ্যেও আল্লাহ পাক তাঁর অবিমিশ্র দ্বীনকে কিছু সংখ্যক হাদীছপন্থী আলেম ও শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাঁচিয়ে রাখেন।

অন্ধকারে আলো : অবক্ষয় যুগে পাঁচজন ছূফী মুহাদ্দিছের মাধ্যমে উপমহাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনের পাঁচটি প্রধান কেন্দ্র পরিচালিত হয়। (১) শায়খ নিযামুদ্দীন আউলিয়া মুহাম্মদ বিন আহমাদ বিন 'আলী (৬৩৪-৭২৫হিঃ/১২৩৬-১৩২৫খৃঃ) দিল্লীতে (২) সাইয়িদ বাহাউদ্দীন যাকারিয়া (৫৭৮-৬৬৬ হিঃ/১১৮০-১২৬৭ খৃঃ) মুলতানে (৩) আমীর কবীর সাইয়িদ 'আলী ইবনু শিহাব হামাদানী (৭১৪-৭৮৬হিঃ/১৩১৪-১৩৮৫খৃঃ) কাশ্মীরে (৪) মুহাদ্দিছ শারফুদ্দীন আবু তাওয়ামা বুখারী (মৃঃ ৭০০ হিঃ/১৩০০ খৃঃ) বাংলাদেশের সোনারগাঁয়ে এবং (৫) তাঁর কীর্তিমান ছাত্র ও জামাতা মাখদূমুল মুল্ক শারফুদ্দীন আহমাদ বিন

ইয়াহ্ইয়া মুনীরী (৬৬১-৭৮২ হিঃ/১২৬৩-১৩৮১ খৃঃ) বিহারে 'মুনীর' নামক স্থানে। অবশ্য শায়খ আহমাদ সারহিন্দী 'মুজাদ্দিদে আলফে ছানী' (৯৭১-১০৩৪ হিঃ/১৫৬৪-১৬২৪ খৃঃ)-কেও আমরা এ কাতারে শামিল করতে পারি।

এছাড়াও দাক্ষিণাত্য, গুজরাট, মালওয়া, খান্দেশ, সিন্ধু, লাহোর, ঝাঁসি, কাল্পী, আগ্রা, লাক্ষ্ণৌ, জৌনপুর প্রভৃতি স্থানে ইলমে হাদীছের কেন্দ্র ছিল।

অবক্ষয় যুগে যে সকল মহান শাসক ইলমে হাদীছের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন, তাঁরা হ'লেন, (১) সুলতান মাহমূদ গযনবী (মৃঃ ৪২১হিঃ/১০৩০খৃঃ), যিনি হানাফী মাযহাব ত্যাগ করে 'আহলেহাদীছ' হন এবং ৩৯২ হিজরীতে লাহোর জয় করে গযনবী শাসন কায়েম করেন। অতঃপর ৪৪৩ হিজরীতে শী'আদের হাতে গযনবী শাসনের অবসান ঘটে। (২) দাক্ষিণাত্যের বাহমনী শাসক সুলতান মাহমূদ শাহ (৭৮০-৭৯৯হিঃ/১৩৭৮-১৩৯৭খৃঃ), সুলতান ফীরোয শাহ, সুলতান আহমাদ শাহ যিনি 'অলিয়ে বাহমনী' নামে খ্যাত ছিলেন প্রমুখ হাদীছভক্ত শাসকদের যুগ চলে ৮৮৬ হিজরী মোতাবেক ১৪৮১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ১০৩ বৎসর ব্যাপী। অতঃপর (৩) পার্শ্ববর্তী গুজরাটের মুযাফফরশাহী সুলতানগণ ইলমে হাদীছের পৃষ্ঠপোষকতায় খ্যাতি লাভ করেন। যদিও মোগল বাদশাহ হুমায়ূন (৯৪১-৪২/১৫৩৪-৩৫খৃঃ) ১৩ মাস ব্যাপী গুজরাট অবরোধ করে রাখার ফলে 'কান্যুল উম্মালের' স্বনামধন্য সংকলক মুহাদ্দিছ 'আলী মুত্তাকী জৌনপুরী (মৃঃ ৯৭৫হিঃ/১৫৬৭খৃঃ) ও মুহাদ্দিছ আব্দুল্লাহ সিন্ধী (মৃঃ ৯৯৩হিঃ/১৫৮৫খৃঃ)-এর ন্যায় খ্যাতনামা মুহাদ্দিছগণ গুজরাট ছেড়ে হেজায চলে যেতে বাধ্য হন। যাই হোক মুযাফফরশাহী সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান মাহমূদ বেগরহা (৮৬৩-৯১৭/১৪৫৮-১৫১১খৃঃ) ও তাঁর পরবর্তী সুলতানদের উদার পৃষ্ঠপোষকতার কারণে আরব দেশ হ'তে বহু মুহাদ্দিছ গুজরাটে আগমন করেন। ফলে ৯৮০ হিজরী মোতাবেক ১৫৭২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ১১৪ বৎসর ব্যাপী সেখানে আহলেহাদীছ আন্দোলন যোরদার থাকে। এই সময় গুজরাটকে 'বাব মক্কা' বা 'মক্কার দ্বার' বলা হ'ত। (৪) দক্ষিণ ভারতের বাহমনী ও মুযাফফরশাহী যুগের সমসাময়িক বাংলাদেশেও আল্লাহ পাক তাঁর এক শাসক বান্দাকে ইলমে হাদীছের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে কবুল করেন। তিনি হ'লেন বাংলার সুলতান আলাউদ্দীন হুসায়েন শাহ বিন সাইয়িদ আশরাফ মাক্কী (৯০০-৯২৪হিঃ/১৪৯৩-১৫১৮খৃঃ), যাঁর সম্পর্কে ইতিপূর্বে আমরা আলোকপাত করে এসেছি।

৩. আধুনিক যুগ : ১১১৪ হিজরী হ'তে বর্তমান সময় কাল পর্যন্ত। উপরোল্লেখিত মুহাদ্দিছ ও শাসকদের উদার পৃষ্ঠপোষকতার ফলে অবক্ষয় যুগে উপমহাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনের দীপশিখা নিবু নিবু করে হ'লেও জ্বলছিল। অবশেষে দ্বাদশ শতাব্দী হিজরীতে এসে আল্লাহ পাকের খাছ মেহেরবাণীতে ফাতাওয়া আলমগীরীর অন্যতম সংকলক দিল্লীর বিখ্যাত মাদরাসা রহীমিয়ার প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা আব্দুর রহীমের ঔরসে জন্মগ্রহণ করলেন উপমহাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনে নীরব বিপ্লব সৃষ্টিকারী বিশ্ববিখ্যাত আলেম 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ্'র অমর লেখক শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (১১১৪-১১৭৬হিঃ/১৭০৩-১৭৬২খৃঃ)। তাঁর শাণিত যুক্তি ও ক্ষুরধার লেখনী জনগণের মধ্যে নিরপেক্ষভাবে ছহীহ হাদীছ অনুসরণের অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে। তাঁর পরে তদীয় স্বনামধন্য চার পুত্র শাহ আব্দুল আযীয, শাহ আব্দুল কাদের, শাহ আব্দুল গণী ও শাহ রফীউদ্দীনের শিক্ষাগুণে ও তাঁদের পরে অলিউল্লাহ পরিবারের গৌরবরত্ন মুজাহিদে মিল্লাত শাহ ইসমাঈল বিন শাহ আব্দুল গণী (১১৯৩-১২৪৬হিঃ/১৭৭৯-১৮৩১খৃঃ) পরিচালিত 'জিহাদ আন্দোলনে'র মাধ্যমে সারা ভারতবর্ষে একটি সামাজিক বিপ্লবের সূত্রপাত ঘটে, যা উপমহাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে বর্তমানে বসবাস রত প্রায় ৫ কোটি আহলেহাদীছ জনগণ সেই আদর্শিক জোয়ারেরই ফসল বলা চলে। এ জোয়ারে কখনও কখনও ভাটা আসলেও স্রোত কখনও থেমে যায়নি। আজও বহু ভাগ্যবান ব্যক্তি তাক্বলীদের মায়াবন্ধন ছিন্ন করে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী জীবন গড়ার শপথ নিয়ে 'আহলেহাদীছ' হচ্ছেন, *ফালিল্লা-হিল হাম্দ*। যে আহলেহাদীছদের রক্তে-মাংসে, অস্থি ও মজ্জায় বালাকোট, বাঁশের কিল্লা, পাঞ্জতার, সিত্তানা, মুল্কা, আম্বেলা, আসমাস্ত, চামারকান্দ ও আন্দামানের রক্তাক্ত স্মৃতি সমূহ, জেল-যুলুম, ফাঁসি, সম্পত্তি বাযেয়াফ্ত, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, দ্বীপান্তর ও কালাপানির অবর্ণনীয় নির্যাতন, গাযী ও শহীদী রক্তের অমলিন ছাপ সমূহ আজও ভাস্বর হয়ে আছে।

নিকট অতীতের কয়েকজন স্মরণীয় মুজাহিদ

(১) সীমান্তের 'আসমাস্ত' কেন্দ্রের ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুজাহিদ পাবনা হেমায়েতপুরের গাযী মাওলানা আব্দুল ওয়াহেদ সালাফী, যিনি 'রাহাতুল্লাহ' ছদ্মনামে উক্ত কেন্দ্রে অবস্থান করতেন। গত ১৯৭২ সালের ৬ই জানুয়ারী পাবনায় নিজ বাড়ীতে মৃত্যুবরণ করেন। (২) মালদহের কারবোনার গাযী মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব সালাফী ওরফে 'মূসা কমাণ্ডার' গত ১৯৮৯ সালে ঠাকুরগাঁও যেলার রাণীশংকৈলের দিহোট গ্রামে মৃত্যুবরণ করেন। যিনি আমীর রহমাতুল্লাহ্‌র

(১৯২১-১৯৪৯খৃঃ) নির্দেশক্রমে ইংরেজ বড়লাটকে হত্যার পরিকল্পনা নিয়ে আসমাস্ত কেন্দ্র হ'তে দিল্লী যাওয়ার পথে পাঞ্জাবের রাজধানী অমৃতসরে পৌঁছে যখন শুনলেন যে, এখানকার স্বর্ণমন্দিরের পুরোহিত শিখগুরু ঈশ্বর সিং পবিত্র কুরআনের উপরে পা রেখে বক্তৃতা করে, তখন তিনি ও তাঁর চারজন সাথী যশোরের গাযী আব্দুর রশীদ, ঢাকার গাযী আলীমুদ্দীন ও অপর দু'জন অবাংগালী মুজাহিদ সর্বপ্রথম এই শয়তানটাকে খতম করার সিদ্ধান্ত নেন এবং পরিকল্পনা মোতাবেক গাযী মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব নিজেই ছদ্মবেশে গিয়ে ঈশ্বর সিংয়ের মাথা কেটে আনেন বলে শ্রুতি আছে। নিজের জীবনের এই সোনালী স্মৃতি রোমন্থনের সময় গাযী ছাহেব নাকি প্রায়ই বলতেন, 'আমার আমলনামায় কিছুই নেই ঈশ্বর সিংয়ের খুন ছাড়া'।

অমৃতসর হ'তে দিল্লী আসার পর তাঁরা শুনলেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বিদ্রূপকারী 'রংগীলা রসূল' বইয়ের গুমনাম লেখক-এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক স্বামী শ্রদ্ধানন্দ (১৮৫৫-১৯২৬খৃঃ) দিল্লী আসছেন। আবার প্রতিজ্ঞা নিলেন যশোরের গাযী আব্দুর রশীদ। দুর্দান্ত সাহস নিয়ে একাই শ্রদ্ধানন্দের কক্ষে ঢুকে সেখানেই তাকে শেষ করে দিয়ে খুশী মনে রাস্তায় বেরিয়ে এলেন। শ্রদ্ধানন্দের আরদালী তাকে পুলিশে ধরিয়ে দেয়। দিল্লীর মুসলমানেরা ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে গিয়ে বললেন আমরা আব্দুর রশীদকে তার ওযনে সোনা দিয়ে খরিদ করে নিব, ওকে মুক্তি দিন। ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, 'ওকে শুধু এটুকু বলতে বলুন যে, মারের কথা আমার মনে নেই'। কিন্তু না, জান্নাত পাগল আব্দুর রশীদ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দিলেন,

میرے عملنامہ میں کوئی نیکی نہیں ھے بجز رسول کو ھجو کرنیوالا اس دشمن کے خون بہا نے کے ، کبھي اسے میں جھٹلا نہیں سکتا-

'আমার আমলনামায় কোন নেকী নেই কেবলমাত্র রাসূলকে বিদ্রূপকারী এই দুশমনটার খুন ছাড়া। আমি এই খুনকে কখনো অস্বীকার করতে পারি না'। *সুব্হা-নাল্লাহ*...। ফাঁসি হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে দু'জন অবাংগালী মুজাহিদ পুলিশের কাছ থেকে তাঁর লাশ ছিনিয়ে এনে ছদর বাযারের মুসলমানদের সহায়তায় দিল্লীর শাহী গোরস্থানে দাফন করেন। মুজাহিদদের এই ক্রমবর্ধমান তৎপরতায় বাধ্য হয়ে ইংরেজ সরকার আমীর রহমাতুল্লাহ্র সঙ্গে সন্ধি করেন ও তাঁদের নিকটে জিহাদ ফাণ্ডের দশ হাযার টাকা সহ বন্দী পাবনার গাযী আবুল কাসেম ওরফে কাসেম ও নীলফামারী জলঢাকার কচুয়া গ্রামের গাযী মাওলানা

Contents

মুজাহিদকে বিনাশর্তে মুক্তি দেন। যে গাযী মাওলানা মুজাহিদ হ'লেন রাজশাহী নওহাটার জনাব মকবুল চেয়ারম্যানের আপন পিতামহ (দাদা)।

(৩) 'আসমাস্ত' কেন্দ্রের 'বড়ী জামা'আতের যিম্মাদার' কমাণ্ডার রাজশাহী বাগমারার গাযী মাওলানা আনোয়ারুদ্দীন যিনি 'আব্দুল হাই' ছদ্মনামে কেন্দ্রে থাকতেন ও পরবর্তীতে 'আব্দুল হাই আনোয়ারী' নামে নিজদেশে পরিচিত হন, তিনি তো মাত্র গত ১৯৯০ সালের ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে নিজ গ্রাম শেরকোলে শেষ নিঃশাস ত্যাগ করলেন। *(ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রা-জে'ঊন)*। (৪) রাজশাহী কাকনহাটের নিকটবর্তী পাঁচগাছিয়ার গাযী আব্দুল জাব্বার, যিনি নিজের ও অন্যের দেওয়া চাঁদা সহ মোট ৬০,০০০/= টাকা নিয়ে জিহাদের উদ্দেশ্যে সীমান্তে পাড়ি দিয়েছিলেন, আর দেশে ফেরেননি। 'আসমাস্ত' কেন্দ্রেই তিনি মৃত্যু বরণ করেন। (৫) রাজশাহীর বাগমারার তাহেরুদ্দীন গাযী, যিনি আমীর নে'মাতুল্লাহ শহীদ হওয়ার পর তাঁর পুত্র বরকতুল্লাহকে আসমাস্ত কেন্দ্রে নাবালক অবস্থায় দেখাশুনা করতেন। (৬) রাজশাহী গোদাগাড়ীর খাজিরাগাতি গ্রামের গাযী মাওলানা আব্দুস সোবহান সপরিবারে জিহাদে চলে গিয়েছিলেন এবং দীর্ঘ নয় বৎসর আসমাস্ত কেন্দ্রে অবস্থান করে দেশে ফিরে এসে মারা যান। (৭) বগুড়া সোন্দাবাড়ী কেন্দ্রের শহীদ ফক্বীর মাহমূদ-এর নাম অনেকেই জানেন। সোন্দাবাড়ী মাদরাসার পার্শ্বে অবস্থিত 'মুজাহিদ কবরস্থান' আজও তাঁদের বিগত ত্যাগ ও কুরবাণীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যেখানে নয়জন মুজাহিদের কবর রয়েছে। (৮) বগুড়ার কাঁটাবাড়িয়ার বেলাল গাযী ছিলেন স্বয়ং 'আসমাস্ত' মুজাহিদ কেন্দ্রে আমীর নে'মাতুল্লাহ্র (১৯১৫-১৯২১খৃঃ) দেহরক্ষী। যিনি মাত্র কিছুদিন পূর্বে মারা গেলেন।[৯] (৯) সাতক্ষীরার স্বনামধন্য গাযী মাখদূম হোসাইন ওরফে 'মার্জ্জুম হোসেন' ব্যবহৃত ১২০০ গ্রাম ওযনের তামার 'বদনা' এখনো জিহাদের স্মৃতি নিয়ে আমাদের সামনে মওজুদ আছে। বৃটিশ ফরমানের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে ওয়াহ্হাবী ধরপাকড়ের হিড়িকের মধ্যেও গাযী মাখদূম হোসায়েন দুর্বার সাহস নিয়ে শিয়ালকোটের এক মসজিদে রাফ'উল ইয়াদায়েন করে ছালাত আদায় করেছিলেন। ফলে সাথে সাথেই তিনি গ্রেফতার হয়ে যান। উল্লেখ্য যে, সেযুগে ছালাতে রাফ'উল ইয়াদায়েন ছিল 'ওয়াহ্হবী' ধরার জন্য একটি উৎকৃষ্ট প্রমাণ। অতঃপর যথারীতি বিচারে তাঁর ফাঁসি হয়। কিন্তু অলৌকিকভাবে ফাঁসির দড়ি তিন তিনবার ছিড়ে গেলে ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট ভয় পেয়ে তাঁকে ছেড়ে দেন। গাযী মাখদূম হোসায়েন তাঁর একমাত্র সম্বল

৯. *সম্ভবতঃ ১৯৮১ সালে নিজ গ্রামে ইন্তেকাল করেন।*

তামার বদনাটি নিয়ে নিঃস্ব অবস্থায় ঘুরতে ঘুরতে একসময় নিজ গ্রাম সাতক্ষীরার ভালুকা চাঁদপুর এসে পৌঁছেন ও পার্শ্ববর্তী এলাকা সমূহে আহলেহাদীছ আন্দোলনের দাওয়াত দিতে থাকেন। আজ সাতক্ষীরার গুণাকরকাটিতে পীরের যে আস্তানা হয়েছে, ওখানকার সমস্ত লোক এক সময় এই গাযী মাখদূম হোসায়েনের ওয়ায শুনে ও কেরামতে মুগ্ধ হয়ে তাঁরই নিকটে 'আহলেহাদীছ' হয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে সাতক্ষীরার আলীপুর গ্রামের মক্তবের শিক্ষক 'পীর' নামধারী জনৈক আব্দুল আযীযের প্ররোচনায় তারা পুনরায় 'হানাফী' হয়ে যায়। তবে যে বাড়ীতে ওয়ায হয়েছিল তারা সহ এখনো সেখানে মুষ্টিমেয় সংখ্যক আহলেহাদীছ আছেন ও তাদের একটি জামে মসজিদও রয়েছে।[১০]

(১০) গাইবান্ধা যেলার সাঘাটা উপযেলার ঝাড়াবর্ষা গ্রামের তিনজন শহীদ ভাই সমীরুদ্দীন, যমীরুদ্দীন ও জামা'আতুল্লাহ্র শোকে অভিভূত হয়ে তাঁদের ভাতিজা আব্দুল বারী কাযী যে শোকগাথা রচনা করেন, তাও আজ আমাদের সামনে রয়েছে। যাঁরা তাঁদের মোট ৮০ বিঘা সম্পত্তির মধ্যে একে একে ৪২ বিঘা সম্পত্তি বিক্রি করে জিহাদের ফাণ্ডে দান করেছিলেন। (১১) একই উপযেলার বারকোনা গ্রামের মাওলানা ওয়াসে'উর রহমান মাত্র সাত দিনের পুত্র সন্তান ইবরাহীম সরকারকে রেখে বালাকোট জিহাদে যোগদান করে শহীদ হয়ে যান। (১২) ময়মনসিংহের মাওলানা আতাউল্লাহ বালাকোট জিহাদে অংশগ্রহণ শেষে গাইবান্ধার সাঘাটা উপযেলার চিনিরপটল গ্রামে এসে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। (১৩) একই উপযেলার ধনারুহা গ্রামের আদি বাসিন্দা গাযী আব্দুল হালীম, আব্দুল হাকীম ও ফহীমুদ্দীন মণ্ডল বালাকোট জিহাদ থেকে ফিরে এসেও বৃটিশের অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতি পাননি। অবশেষে গাযী আব্দুল হালীম ঘর ছেড়ে রংপুর হারাগাছের সেরুডাঙ্গা জংগলে ৩/৪ বৎসর নির্জন বাসের পর সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন *(ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রা-জে'উন)*। (১৪) ১৭ বৎসর বয়সে জিহাদে অংশগ্রহণকারী এবং সীমান্ত হ'তে বাংলাদেশে হিজরতকারী গাইবান্ধা শহরের হক্কানী পরিবারের প্রাণপুরুষ আলহাজ্জ এফাজুদ্দীন আহমাদ হক্কানী, যিনি ১৯৮৩ সালের ১২ই নভেম্বর তারিখে ১৩৩ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন এবং আমাদের জন্য রেখে গেছেন তাঁর ব্যবহৃত তরবারী, জিহাদের পোষাক ও ব্যাজ, জিহাদী প্রেরণার উৎস হিসাবে।[১১]

---

১০. মাননীয় লেখকের উদ্যোগে তাঁর সংগঠনের মাধ্যমে ১৯৯৪ সালে উক্ত মসজিদটি নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় -প্রকাশক।

১১. বর্তমানে দারুল ইমারত আহলেহাদীছ, নওদাপাড়া, রাজশাহীর 'জিহাদ গ্যালারী'-তে তরবারী, ব্যাজ, বদনা ও শোকগাথা রক্ষিত আছে। -প্রকাশক।

(১৫) চাঁপাই নবাবগঞ্জের নারায়ণপুরের কীর্তিমান সন্তান সম্ভবতঃ মাওলানা এনায়েত আলীর (১২০৭-৭৪হিঃ/১৭৯২-১৮৫৮খৃঃ) খলীফা রফী মোল্লার পুত্র ও খলীফা মৌঃ আমীরুদ্দীন তাবলীগের জামা'আত নিয়ে কানসাট এলাকার তেররশিয়া দুর্লভপুর গ্রামে গেলে এবং সেখানকার একটি বিদ'আতী প্রথার প্রতিবাদ করলে স্থানীয় বিদ'আতী মুসলমানেরা তাঁকে 'ওয়াহ্হাবী' বলে ইংরেজের হাতে ধরিয়ে দেয়। বিচারে তাঁর ফাঁসির আদেশ হ'লে শহীদ হওয়ার আনন্দে তিনি 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে ওঠেন। ইংরেজ বিচারক এতে ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁর মৃত্যুদণ্ড রদ করে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দেন ও তাঁর সমস্ত সম্পত্তি বাযেয়াফ্ত করা হয়। মূলতঃ এটি ছিল আহলেহাদীছদেরকে জিহাদ ও শাহাদাতের ব্যাপারে নিরুৎসাহ করার একটি শয়তানী পলিসি মাত্র। ১১ বৎসর আন্দামানের কালাপানিতে বন্দীজীবন কাটিয়ে অবশেষে মুক্তি পেয়ে তিনি ১৮৮৩ সালে দেশে ফেরেন। তাঁর আনীত কালাপানি বন্দীদশার স্মৃতিবাহী ৭ ইঞ্চি লম্বা ঝিনুক, প্রায় ১ ফুট দৈর্ঘ্যের শামুক, ১০ ইঞ্চি লম্বা ও ৯ ইঞ্চি ব্যাসের কড়ি আজও বিহারের ছাহেবগঞ্জের আগলই নারায়ণপুরের গিয়াছুদ্দীন মাস্টারের নিকটে এবং বড় বাক্সটা চাঁপাই নবাবগঞ্জের রহনপুরের আনারপুর গ্রামের বাহারুল্লাহ মোল্লার নিকটে রক্ষিত আছে, আমাদের জন্য জিহাদ ও কুরবানীর অমলিন স্মৃতি হিসাবে। *আল্লাহুম্মাগ্ফির লাহুম অরহাম্হুম অ'আ-ফেহিম অ'ফু 'আনহুম। -আমীন!*

যুলুম ও নির্যাতনের আগুনে পোড়া নিখাদ তাওহীদবাদী জামা'আতে আহলেহাদীছ তাই চিরকালীন জিহাদী উত্তরাধিকারের নাম। যে কোন মূল্যের বিনিময়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারকে অক্ষুণ্ন রাখার চিরন্তন শহীদী কাফেলার নাম।

আল্লাহ বলেন,

وَلاَ تَهِنُوْا وَلاَ تَحْزَنُوْا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ –(آل عمران ١٣٩)–

'তোমরা হীনবল হয়ো না, চিন্তিত হয়ো না, ঈমানদার হ'লে তোমরাই বিজয়ী' *(আলে ইমরান ৩/১৩৯)*।

উল্লেখ্য যে, জিহাদ আন্দোলনে বাংলাদেশের লোকেরাই অধিকহারে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং আল্লাহ্র রহমতে বর্তমান পৃথিবীতে আহলেহাদীছ জনসংখ্যা বাংলাদেশেই সর্বাধিক এবং বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের চাইতে বৃহত্তর রাজশাহীতেই তাদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। *ফালিল্লা-হিল হাম্দ হাম্দান কাছীরান ত্বাইয়েবাম মুবা-রাকান ফীহ্।*

طريق النجاة ، الدعوة والجهاد

মুক্তির একই পথ
দাওয়াত ও জিহাদ

বন্ধুগণ!

১৯৮০ সালের ৫ ও ৬ই এপ্রিল ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র ১ম ঐতিহাসিক জাতীয় সম্মেলন ও ইসলামী সেমিনারে আমাদের পঠিত 'তাওহীদের শিক্ষা ও আজকের সমাজ' শীর্ষক নিবন্ধে আমরা সার্বিক জীবনে তাওহীদের শিক্ষা গ্রহণ ও অনুশীলনের জন্য আপনাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলাম। আজকের এ বাধা সংকুল পরিবেশে আমরা আপনাদেরকে তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য চূড়ান্ত জিহাদের পথ বেছে নেওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি। আমরা বিশ্বাস করি দাওয়াত ও জিহাদ ব্যতীত তাওহীদ প্রতিষ্ঠা ও জাহান্নাম হ'তে মুক্তির আর কোন পথ মুমিনের জন্য খোলা নেই। আর এই জিহাদ অর্থ কোন অবস্থাতেই বাতিলের সঙ্গে আপোষ না করা। নিরন্তর দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে মানুষকে তাওহীদ বুঝাতে হবে ও সাথে সাথে সমাজ সংস্কারের নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। নূহ (আঃ)-এর প্রায় সাড়ে নয়শত বছরের দিন-রাতের অবিরাম প্রচেষ্টার কথা মনে রাখতে হবে। নূহ (আঃ) হ'তে মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত সকল যুগের আম্বিয়ায়ে কেরাম মূলতঃ আল্লাহ্র পথের দাঈ বা আহ্বানকারী ছিলেন। তাঁদের স্ব স্ব যুগের প্রচলিত জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে তাঁরা সর্বদা মানুষকে ইলাহী হেদায়াতের পথ দেখিয়েছেন। বিনিময়ে তাঁরা সমাজে ধিকৃত ও নিগৃহীত হয়েছেন। মেজরিটির (Majority) সমর্থন হারিয়েছেন। সমাজ বিরোধী, ধর্মবিরোধী, ঐক্য বিরোধী হিসাবে চিহ্নিত হয়েছেন। জন্মভূমি হ'তে বিতাড়িত হয়েছেন। মান-সম্মান, জীবন ও সম্পদ হারিয়েছেন। এমনকি চির বিশ্বাসী 'আল-আমীন' মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত 'কায্যাব' মহা মিথ্যাবাদী বলে অভিহিত হয়েছেন। তথাপি হক-এর দাওয়াত হ'তে তিনি এক চুল বিচ্যুত হননি। আমাদেরকেও এ নশ্বর জীবনের প্রতিটি নিঃশ্বাস হক্ব–এর দাওয়াতে ব্যয় করতে হবে। সকল দুনিয়াবী প্রলোভন ও স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে মানুষকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ার আহ্বান জানিয়ে যেতে হবে। এজন্য সকল কষ্ট ও মুছীবতকে হাসিমুখে বরণ করে নিতে হবে। দুনিয়াবী সুখ-শান্তির চাইতে জান্নাতের

Contents

সুখ–শান্তি অনেক বড়। আমাদের জীবনের মালিক যেমন আমরা নই, আমাদের মালের মালিকও তেমনি আমরা নই। বরং আসমানেই আমাদের হায়াত-মউত ও রিযিক নির্ধারিত হয়ে থাকে। আল্লাহ্র দেওয়া জান ও মাল আল্লাহ্র পথেই ব্যয় করতে হবে, শয়তানের পথে নয়। জান্নাতের বিনিময়ে তিনি মুমিনের জান ও মাল খরিদ করে নিয়েছেন। আমরা তার খরিদা গোলাম মাত্র। তাই গোলামের কোন অধিকার নেই মালিকের বিরুদ্ধে কাজ করার বা মালিকের সম্পদ নিজের খেয়াল-খুশী মত ব্যয় করার। যদি করি তাহ'লে জাহান্নামের মর্মান্তিক শাস্তি বরণ করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। আল্লাহ চান বান্দা সর্বদা তাঁর পথে মানুষকে ডাকুক। যেমন তিনি তাঁর শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে বলেন, وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلاَ تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ، (القصص ٨٧)– 'আপনি ডাকুন আপনার রব-এর দিকে এবং অবশ্যই অবশ্যই আপনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না' *(ক্বাছাছ ২৮/৮৭)*। অন্যত্র তিনি বলেন,

يَا أَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ، إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ، (المائدة ٦٧)–

'হে রাসূল! আপনি পৌঁছে দিন যা আপনার প্রতি নাযিল করা হয়েছে আপনার প্রভুর পক্ষ থেকে। যদি পৌঁছে না দেন, তাহ'লে আপনি তাঁর রিসালাতের দায়িত্ব পালন করলেন না। আল্লাহ আপনাকে লোকদের অনিষ্টকারিতা হ'তে রক্ষা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফির গোষ্ঠীকে সৎপথ প্রদর্শন করবেন না' *(মায়েদাহ ৫/৬৭)*। কি সাংঘাতিক ধম্‌কি। এখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নেই। তাঁর উম্মত হিসাবে আমাদেরকেই সে দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে। অতঃপর দাওয়াতের তিনটি স্তর সম্পর্কে এক্ষণে আমরা আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

দাওয়াতের তিনটি স্তর

১- দাওয়াত ফরযে 'আয়েন : প্রত্যেক মুমিনের উপরে যেটা ফরয, তাকে 'ফরযে আয়েন' বলা হয়। যা পালন না করলে কঠিন গুনাহ্গার হ'তে হয় এবং অস্বীকার করলে কাফের হ'তে হয়। যেমন ছালাত, ছিয়াম ইত্যাদি। আল্লাহ্র দিকে দাওয়াত দেওয়া প্রত্যেক মুমিনের জন্য 'ফরযে আয়েন' তখন হয়, যখন সমাজে অন্যায়-অনাচার বিজয় লাভ করে এবং নেকী ও ন্যায়নীতি পরাভূত হয়। যেমন আল্লাহ বলেন, كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَــنِ

الْمُنْكَــرِ- (آل عمــران ١١٠)- 'তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত। তোমাদের উত্থান ঘটানো হয়েছে মানব জাতিকে ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায় থেকে নিষেধ করার জন্য' *(আলে ইমরান ৩/১১০)*। এখানে উম্মতে মুহাম্মাদীর প্রত্যেকের উপরে দাওয়াত ফরয করা হয়েছে, যা লংঘন করলে গুনাহগার হ'তে হবে।

২- দাওয়াত ফরযে কিফায়াহ : সমাজের কিছু মুমিন দায়িত্ব পালন করলে অন্যদের জন্য যেটা যথেষ্ট হয়, তাকে 'ফরযে কিফায়াহ' বলে। যেমন ছালাতে জানাযাহ। হাযার পড়শীর মধ্যে কিছু সংখ্যক মুমিন জানাযা ও দাফনে অংশ গ্রহণ করলে বাকীদের ফরয আদায় হয়ে যায়। কিন্তু কেউ অংশ গ্রহণ না করলে প্রত্যেকেই গুনাহগার হবে। তখন ওটা 'ফরযে আয়েন'-এর পর্যায়ভুক্ত হয়ে থাকে।

দাওয়াত 'ফরযে কিফায়াহ' তখনই হবে, যখন সর্বত্র নেকী ও ন্যায়নীতি বিজয় লাভ করবে, অন্যায় ও দুর্নীতি পরাভূত হবে। এই সময় কিছু লোক দাওয়াতের কাজ করলে বাকীদের জন্য যথেষ্ট হবে। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ- (آل عمران ١١٠)-

'তোমাদের মধ্যে একটা দল থাকা চাই যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে ডাকবে এবং ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায় থেকে নিষেধ করবে। আর তারাই হবে সফলকাম' *(আলে ইমরান ৩/১০৪)*।

৩- দাওয়াত মুবাহ : 'মুবাহ' অর্থ যে কাজ করলে ছওয়াব আছে, না করলে গুনাহ নেই। সমাজে যখন ন্যায়নীতি বিজয়ী অবস্থায় থাকবে, নেকীর কাজ সর্বত্র বিরাজিত হবে এবং সমাজের পক্ষ হ'তে কিছু লোক সর্বদা দাওয়াতের জন্য নির্দিষ্টভাবে নিয়োজিত থাকবেন, তখন অন্যদের জন্য দাওয়াতের কাজ 'মুবাহ' পর্যায়ভুক্ত হবে। দাওয়াত দিলে তারা ছওয়াব পাবেন, না দিলে গুনাহগার হবেন না। আল্লাহ বলেন,

فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوْا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ- (التوبة ١٢٢)-

‘তোমাদের প্রত্যেক গোত্র হ’তে কেন একটা দল বেরিয়ে আসছ না দ্বীনের জ্ঞান হাছিল করার জন্য? অতঃপর ফিরে গিয়ে তারা তাদের কওমকে জাহান্নামের ভয় দেখাবে যাতে তারা সাবধান হয়ে যায়’ *(তাওবাহ ৯/১২২)*।

বর্তমান যুগে অন্যায়-অবিচার সমাজে চরমভাবে ব্যাপকতা লাভ করেছে। ন্যায়নীতি মুখ থুবড়ে পড়েছে। দুর্নীতি বুকটান করে এগিয়ে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় মানুষকে আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দেওয়া প্রত্যেক মুমিন-মুসলমানের উপর ‘ফরযে আয়েন’ বলে মনে করি। যিনি যেখানে যে অবস্থায় থাকুন, সর্বাবস্থায় দাওয়াতের ফরয আদায় করতে হবে। বাপ-ভাইয়েরা তাদের কর্মস্থলে, ছেলে-মেয়েরা তাদের শিক্ষাঙ্গনে, মা-বোনেরা তাদের সংসার জীবনে স্ব স্ব গণ্ডীর মধ্যে দাওয়াতের কাজ করবেন। নিজ গৃহকে ইসলাম বিরোধী সকল অপপ্রভাব থেকে মুক্ত রাখবেন। ঘরে রহমতের ফেরেশতা যাতে সর্বদা যাতায়াত করে, তার পরিবেশ তৈরি রাখবেন।

দা‘ঈ-র জন্য অপরিহার্য একটি দায়িত্ব

আল্লাহ্র পথের দা‘ঈ বা মুবাল্লিগের অপরিহার্য দায়িত্ব এতটুকু যে, তিনি তার শ্রোতাদের জন্য প্রিয়বস্তু নির্ধারণ করে দিবেন, তারা আল্লাহ্কে ‘অলি’ বা অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করবেন, না ত্বাগূত-কে? যদি আল্লাহ্কে অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করেন তবে যে কাজ করলে তিনি খুশী হন, যে কোন কিছুর বিনিময়ে তাই-ই করে যেতে হবে। তার জীবনের সকল কর্মচাঞ্চল্য আল্লাহ্র ভালোবাসাকে কেন্দ্র করেই পরিচালিত হবে। এইভাবে প্রিয়বস্তু পরিবর্তনের মাধ্যমেই আসবে জীবন ও সমাজের পরিবর্তন। আসবে কাংখিত সমাজ বিপ্লব। উক্ত মর্মে নিম্নোক্ত আয়াত দু’টি অনুধাবন করুন। আল্লাহ বলেন,

لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لاَ انْفِصَامَ لَهَا وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ- اللهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوْرِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِنَ النُّوْرِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ-(البقرة ٢٥٦-٢٥٧)-

‘দ্বীনের মধ্যে কোন যবরদস্তি নেই। ভ্রষ্টতা থেকে হেদায়াত স্পষ্ট হয়ে গেছে। এক্ষণে যে ব্যক্তি ত্বাগূতকে অস্বীকার করে আল্লাহ্র উপরে ঈমান আনলো, সে

ব্যক্তি মযবুত রশি ধারণ করল, যা ছিন্ন হবার নয়; আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ'। 'আল্লাহ মুমিনদের একমাত্র অভিভাবক। তাদেরকে তিনি অন্ধকার হ'তে আলোর পথে বের করে এনেছেন। পক্ষান্তরে যারা কাফের, তাদের অভিভাবকবৃন্দ হ'ল ত্বাগূত সমূহ। যারা তাদেরকে আলো থেকে অন্ধকারের পথে নিয়ে যায়। ওরা জাহান্নামের অধিবাসী, যেখানে তারা স্থায়ী বাশিন্দা হবে' *(বাক্বারাহ ২/২৫৬-৫৭)*। অতঃপর শ্রবণ করুন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণী-

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ– متفق عليه

'তোমাদের মধ্যে কেউ মুমিন হবে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকটে তার পিতা-মাতা, সন্তানাদি ও সকল মানুষের চেয়ে প্রিয়তর হব'।[১২]

হক ও বাতিল পন্থীদের চারটি স্তর

হক ও বাতিল পন্থীদের মধ্যে সাধারণতঃ চারটি স্তর দেখা যায়। (১) যিনি হক বুঝেন কিন্তু হক অনুযায়ী আমলে অলসতা করেন (২) যিনি হক বুঝেন ও হক অনুযায়ী আমল করেন। কিন্তু হক-এর দাওয়াত দিতে অলসতা করেন (৩) যিনি হক বুঝেন, সে অনুযায়ী আমল করেন, হক-এর দাওয়াত দেন, কিন্তু হক-এর জন্য জিহাদ করবার সৎসাহস নেই (৪) যিনি হক বুঝেন, সে অনুযায়ী আমল করেন, হক-এর দাওয়াত দেন এবং যে কোন মূল্যে হক প্রতিষ্ঠার জন্য জান-মাল নিয়ে জিহাদ করেন।

বাতিল পন্থীদের মধ্যেও উপরোক্ত চারটি স্তর রয়েছে।

এক্ষণে আল্লাহ্র পথে দা'ঈর দায়িত্ব হবে এই যে, তিনি একজন বাতিলপন্থীকে শুরুতে ১ম স্তরের হকপন্থী হবার দাওয়াত দিবেন। অতঃপর ধীরে ধীরে তাকে ৪র্থ স্তরে উন্নীত করার চেষ্টা নিবেন। এজন্য যেসব কষ্ট ও মুছীবতের সম্মুখীন হ'তে হবে, তা তাকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির স্বার্থে হাসিমুখে বরণ করে নেবার উপদেশ দিবেন। সামান্য একজন নারী বা পুরুষের ভালবাসা পাওয়ার জন্য মানুষ যেখানে সর্বস্ব ত্যাগ করতে পারে, সেখানে আল্লাহ্র ভালবাসা পাওয়ার জন্য তাকে অবশ্যই সর্বাধিক ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

১২. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৭।*

দাওয়াত না বিজয় সাধন?

দ্বীনের দাওয়াত না দ্বীনের বিজয় সাধন, কোন্‌টি মুমিনের উপরে ফরয এ নিয়ে অনেক সময় তর্কের সৃষ্টি হয় । অথচ মুমিনের উপরে ফরয দায়িত্ব হ'ল দাওয়াত দেওয়া, অন্য কিছু নয়। হেদায়াত দান বা দুনিয়াতে বিজয় দান সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র ইচ্ছাধীন। যদি আমাদের দাওয়াত আল্লাহ্‌র নিকটে কবুল হয়ে যায় তাহ'লে তিনি এ দাওয়াতের বিনিময়ে দুনিয়াতেই দ্বীনের বিজয় দান করতে পারেন। নইলে আখেরাতের বিজয় ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির বিষয়ে তো আল্লাহ্‌র ওয়াদা রয়েছেই।

আল্লাহ বলেন,

وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِـــنْ عِنْـــدِ اللهِ الْعَزِيْـــزِ الْحَكِـــيْمِ– 'সাহায্য কেবলমাত্র মহা প্রতাপান্বিত ও মহাজ্ঞানী আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই আসে' *(আলে ইমরান ৩/১২৬)*। অন্যত্র তিনি এরশাদ করেন, إِنْ يَّنْصُرْكُمُ اللهُ فَلاَ غَالِـــبَ لَكُـــمْ– 'যদি আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেন, তাহ'লে কেউই তোমাদের উপরে জয়লাভ করতে পারবে না' *(আলে-ইমরান ৩/১৬০)*।

এক্ষণে যদি দ্বীনের বিজয় সাধনকে আন্দোলনের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়, তবে সেখানে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তিনটি মারাত্মক ক্ষতির আশংকা রয়েছে। (১) দাওয়াতকে আল্লাহ্‌র পসন্দনীয় বানাবার প্রচেষ্টায় ভাটা পড়বে (২) দ্বীনের বিজয় সাধনের দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ হবে ও দাওয়াতের কাজ ক্ষতিগ্রস্ত হবে (৩) আল্লাহ না করুন যদি দুনিয়াবী বিজয় না আসে, তাহ'লে দা'ঈর মধ্যে হতাশা ও নৈরাশ্য দেখা দিবে। পরিশেষে হয়তবা সে হক্ব-এর দাওয়াত থেকেই মুখ ফিরিয়ে নিবে। অবশ্য ইসলামের সার্বিক বিজয় সাধনের লক্ষ্য নিয়েই দা'ঈ-কে কাজ করে যেতে হবে এবং সেই মূল লক্ষ্য অর্জনের পথেই তাকে দাওয়াত দিয়ে যেতে হবে। আল্লাহ বলেন,

هُوَ الَّذِيْ أَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدٰى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ، (الصف ٩)–

‘তিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়াত ও সত্য দ্বীন সহ প্রেরণ করেছেন, যাতে অন্যান্য দ্বীন সমূহের উপরে তা জয়লাভ করে। যদিও মুশরিকরা এটা অপসন্দ করে’ *(ছফ ৬১/৯)*।

এই বিজয় প্রাথমিকভাবে অবশ্যই আক্বীদাগত এবং আমলগত বিজয়, যাকে আধুনিক পরিভাষায় সাংস্কৃতিক বিজয় বলা হয়ে থাকে। পৃথিবীতে প্রচলিত সকল ধর্ম ও মতাদর্শ অবশ্যই ইসলামের নিকটে পরাজিত এতে কোনই সন্দেহ নেই। অতঃপর পৃথিবীতে এমন কোন মাটির ঘর বা ঝুপড়িও থাকবে না যেখানে ইসলামের দাওয়াত প্রবেশ করবে না। হয় তারা ইসলাম কবুল করে সম্মানিত হবে, নয় ইসলামের আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য হবে। যেমন নিম্নোক্ত হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

عَنِ الْمِقْدَادِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: لاَ يَبْقَى عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ بَيْتُ مَدَرٍ وَلاَ وَبَرٍ إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللهُ كَلِمَةَ الإِسْلاَمِ بِعِزِّ عَزِيْزٍ أَوْ ذُلِّ ذَلِيْلٍ إِمَّا يُعِزُّهُمُ اللهُ فَيَجْعَلُهُمْ مِنْ أَهْلِهَا أَوْ يُذِلُّهُمْ فَيَدِيْنُوْنَ لَهَا، قُلْتُ فَيَكُوْنُ الدِّيْنُ كُلُّهُ لِلّٰهِ- رواه أحمد-

মিক্বদাদ বিন আসওয়াদ (রাঃ) বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছেন যে, ‘ভূপৃষ্ঠে এমন কোন মাটির ঘর বা তাঁবু থাকবে না, যেখানে আল্লাহ ইসলামের বাণী পৌঁছে দিবেন না- সম্মানীর ঘরে সম্মানের সাথে এবং অসম্মানীর ঘরে অসম্মানের সাথে। আল্লাহ যাদেরকে সম্মানিত করবেন, তাদেরকে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণের যোগ্য করে দিবেন। আর যাদেরকে তিনি অসম্মানিত করবেন, তারা (জিযিয়া দানে) ইসলামের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হবে। আমি বললাম, তাহ’লে তো দ্বীন পূর্ণরূপে আল্লাহ্র জন্য হয়ে যাবে’ (অর্থাৎ সকল দ্বীনের উপরে ইসলাম বিজয় লাভ করবে)।[১৩] এই হাদীছে বিশ্বব্যাপী ইসলামের রাজনৈতিক বিজয়ের ইঙ্গিত রয়েছে। এজন্য প্রত্যেক দা‘ঈকে আক্বীদা ও আমলে উত্তম নমুনা হ’তে হবে যার দ্বারা অমুসলিমদের হৃদয় জয় করা সম্ভব হবে। রাজনৈতিক বিজয় লাভ করার জন্য যা আবশ্যিক পূর্বশর্ত।

---

১৩. *আহমাদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত-আলবানী হা/৪২; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩।*

জিহাদ*

জাহান্নামের কঠিন আযাব হ'তে বাঁচার দ্বিতীয় শর্ত হ'ল 'জিহাদ'। যেমন আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيْمٍ - تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ- (الصف ١٠-١١)-

'হে বিশ্বাসীগণ! আমি কি তোমাদের এমন একটি ব্যবসায়ের কথা বলে দেব না- যা তোমাদেরকে মর্মান্তিক আযাব হ'তে মুক্তি দেবে? তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপরে ঈমান আনবে এবং তোমাদের মাল ও জান দ্বারা আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম পথ, যদি তোমরা বুঝ' *(ছফ ৬১/১০-১১)*।

আল্লাহ্কে খুশী করার জন্য কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে মুমিনের সকল প্রচেষ্টা নিয়োজিত করাকে শরী'আতের পরিভাষায় 'জিহাদ' বলে। অন্য অর্থে স্বীয় নফসের বিরুদ্ধে, শয়তানের বিরুদ্ধে এবং মুশরিক-মুনাফিক ও ফাসেকদের বিরুদ্ধে জান-মাল ও যবান দিয়ে লড়াই করাকে 'জিহাদ' বলে। আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ- (التوبة ٧٣)-

'হে নবী! আপনি জিহাদ করুন কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে এবং তাদের উপরে কঠোর হৌন। তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। সেটা কতই না মন্দ ঠিকানা' *(তাওবাহ ৯/৭৩, তাহরীম ৬৬/৯)*।

(ক) নফসের বিরুদ্ধে জিহাদের প্রক্রিয়া : নফ্স কলুষিত হয় ও আখেরাতের চিন্তা থেকে দূরে সরিয়ে নেয় এমন সব বস্তুবাদী সাহিত্য, পত্র-পত্রিকা, প্রচার মাধ্যম, আলোচনা মজলিস, ক্লাব, সমিতি, দল ও সংগঠন প্রভৃতি হ'তে এবং

** এজন্য মাসিক 'আত-তাহরীক'-এর 'দরসে কুরআন' কলামে প্রকাশিত 'জিহাদ ও ক্বিতাল' নিবন্ধটি পাঠ করুন (৫ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা ডিসেম্বর ২০০১)।- প্রকাশক।*

ইসলামের নামে সকল শিরকী ও বিদ‘আতপন্থী সংগঠন হ’তে নিজেকে দূরে রাখতে হবে এবং দৈনিক দেহের খোরাক জোগানোর ন্যায় রূহের ঈমানী খোরাক জোগাতে হবে। সর্বদা দ্বীনী আলোচনা, দ্বীনী আমল ও প্রশিক্ষণ এবং দ্বীনী পরিবেশের মধ্যে উঠাবসার মাধ্যমে রূহকে তাযা রাখতে হবে। আল্লাহ বলেন,

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُوْنَ وَجْهَهُ وَلاَ تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلاَ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا- (الكهف ٢٨)-

‘(হে নবী!) আপনি নিজেকে ঐসব লোকদের সঙ্গে ধৈর্যের সাথে ধরে রাখুন, যারা ডাকে তাদের প্রভুকে সকালে ও সন্ধ্যায়; তারা কামনা করে কেবলমাত্র আল্লাহ্র চেহারা। আপনি তাদের থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিবেন না। আপনি কি দুনিয়াবী জীবনের জৌলুস চান? আপনি ঐ ব্যক্তির অনুসরণ করবেন না যার অন্ত র আমাদের স্মরণ থেকে গাফেল হয়েছে এবং সে প্রবৃত্তির অনুসারী হয়েছে ও তার কাজকর্মে সীমালংঘন এসে গিয়েছে’ *(কাহ্ফ ১৮/২৮)*।

(খ) শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদের প্রক্রিয়া : আল্লাহ বা তাঁর প্রেরিত শরী‘আতের কোন বিধান সম্পর্কে মনের মধ্যে যখনই কোন সন্দেহ উঁকি মারবে, তখনই তাকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিতে হবে। যেমন (১) ইসলামের বিধান সমূহ এযুগে অচল (২) ইসলামী শরী‘আতের চাইতে মানব রচিত বিধান সমূহ অনেক উন্নত ও কল্যাণময় (৩) হাদীছ সন্দেহযুক্ত, কুরআনই যথেষ্ট (৪) হাদীছে কোন ছহীহ-যঈফ নেই, সব হাদীছই সঠিক (৫) ইমাম-মাযহাব বা পীর মানাই যথেষ্ট, হাদীছ মানার প্রয়োজন নেই ইত্যাকার শয়তানী ধোঁকা সমূহ। নিজের ঘরের জানালা পথে চোর উঁকি মারলে যেমন আমরা তার পিছু ধাওয়া করি, তেমনি মনের জানালা পথে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের কোন আদেশ বা নিষেধের কার্যকারিতা সম্পর্কে কোনরূপ সন্দেহবাদ উঁকি-ঝুঁকি মারলে তাকেও প্রথম আঘাতে দূরে নিক্ষেপ করতে হবে। অহেতুক সন্দেহ ও যুক্তিবাদের ধূম্রজাল সৃষ্টিকারী অতি বুদ্ধিমানদের কাছ থেকে এবং বে-দলীল অন্ধ অনুসারীদের কাছ থেকে দূরে থাকতে হবে। আল্লাহ বলেন,

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوضُوْنَ فِيْ آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوْا فِي حَدِيْثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ- (الأنعام ٦٨)-

‘যখন তুমি লোকদের দেখবে যে, তারা আমার আয়াত নিয়ে উপহাস মূলক আলোচনায় লিপ্ত হয়েছে, তখন দূরে সরে থাকবে, যে পর্যন্ত না তারা অন্য আলোচনায় লিপ্ত হয়। (তাদের যুক্তিবাদের ফলে) যদি শয়তান তোমাকে ভুলিয়ে দেয়, তবে স্মরণ হওয়ার পরেই তুমি আর সীমা লংঘনকারীদের সাথে বসো না’ *(আন‘আম ৬/৬৮)*।

(গ) কাফির, মুশরিক, মুনাফিক ও ফাসিকদের বিরুদ্ধে জিহাদের প্রক্রিয়া : হাত দ্বারা, জান দ্বারা, মাল দ্বারা ও অন্তর দ্বারা তাদের বিরুদ্ধে ঘরে-বাইরে সর্বত্র ব্যাপক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। যাবতীয় শিরক, বিদ‘আত ও ফিস্ক্ব-ফুজূরীর বিরুদ্ধে মুমিনের গৃহকে লৌহ কঠিন দূর্গ হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। মুমিনের চিন্তা-চেতনা, কথা ও কলম, আয় ও উপার্জন সবকিছুই সর্বদা নিয়োজিত থাকবে বাতিলের বিরুদ্ধে আপোষহীন যোদ্ধার মত। প্রত্যেক গ্রামে ও মহল্লায় আল্লাহ্র সেনাবাহিনী হিসাবে বয়স্ক ও তরুণদের একটি জামা‘আতকে সংগঠিত হ’তে হবে, যারা আমীরের নির্দেশনা মোতাবেক পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী নিজেদের জীবন, পরিবার ও সমাজ গড়ে তুলতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবেন ও সমাজ সংস্কারে ব্রতী হবেন। হক্বপন্থী এই লোকদের সংখ্যা কোন স্থানে যদি তিনজনও থাকেন, তবুও তাদেরকে একজন আমীরের অধীনে জামা‘আতবদ্ধ হ’তে হবে ও ইসলামী অনুশাসন মোতাবেক জীবন যাপন করতে হবে। তথাপি ত্বাগূতী শক্তির নিকটে যাওয়া যাবে না বা বিশৃংখল জীবন যাপনও করা চলবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَحِلُّ لِثَلاَثَةِ نَفَرٍ يَكُوْنُوْنَ بِأَرْضِ فَلاَةٍ إِلاَّ أُمِّرُوْا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ، رواه أحمد وأبو داؤد-

‘তিন জন লোকের জন্যও হালাল নয় কোন নির্জন ভূমিতে অবস্থান করা তাদের মধ্যে একজনকে আমীর নিয়োগ না করা পর্যন্ত’।[১৪]

---

১৪. আহমাদ, আবুদাঊদ, ছহীহ জামে‘ ছাগীর -আলবানী হা/৫০০; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/৯৬০।

আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا أَطِيعُوْا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، ذٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيْلاً- (النساء ٥٩)-

'হে মুমিনগণ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র এবং আনুগত্য কর রাসূলের ও তোমাদের মধ্যকার আমীরের। অতঃপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদ কর, তাহ'লে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও, যদি তোমরা আল্লাহ ও বিচার দিবসের উপরে বিশ্বাসী হয়ে থাক। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর ও পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম' *(নিসা ৪/৫৯)*।

অত্র আয়াতে রাসূলের আনুগত্যের সাথে আমীরের আনুগত্যকে যুক্ত করা হয়েছে। কেননা রাসূলের মৃত্যুর পরে ক্বিয়ামত পর্যন্ত রাসূলের রেখে যাওয়া দ্বীন বাস্তবায়নের মূল দায়িত্ব থাকবে 'আমীর'দের উপরে। তবে আমীরের আনুগত্য আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যের শর্তাধীন। এ আয়াতে বুঝা যায়, ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম থাক বা না থাক মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে সর্বাবস্থায় 'আমীর' থাকা যরূরী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ ..... وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِىْ عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً- رواه مسلم-

'যে ব্যক্তি মারা গেল অথচ তার গর্দানে আমীরের আনুগত্যের বায়'আত থাকল না, সে জাহেলী হালতে মৃত্যুবরণ করল'।[১৫]

সকল প্রকার মা'রূফ বা শরী'আত অনুমোদিত বিষয়ে আমীরের নির্দেশ পালন করা মামূরের জন্য ফরয। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .....وَمَنْ يُّطِعِ الأَمِيْرَ فَقَدْ أَطَاعَنِىْ وَمَنْ يَّعْصِ الأَمِيْرَ فَقَدْ عَصَانِىْ- متفق عليه-

১৫. মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৭৪ 'নেতৃত্ব ও বিচার' অধ্যায়।

অর্থ: '.... এবং যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য করল সে আমার আনুগত্য করল। আর যে ব্যক্তি আমীরের অবাধ্যতা করল সে আমার অবাধ্যতা করল'।[১৬]

অন্যত্র আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তার উম্মতকে জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন, আমীরের আদেশ শ্রবণসহ ৫টি আদেশ প্রদান করেছেন।[১৭] তিনি বলেন, يَدُ اللهِ عَلَي الْجَمَاعَةِ 'জামা'আতের উপর আল্লাহ্র হাত থাকে'।[১৮]

সম্ভবতঃ এত কড়া হুকুমের কারণেই ছাহাবায়ে কেরাম রাসূলের মৃত্যুর পর তাঁর দাফন কার্যের পূর্বেই 'আমীর' নিয়োগের প্রতি এত অধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন এবং যে জন্য রাসূল (ছাঃ)-এর দাফন কার্য তিনদিন বিলম্বিত হয়। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত থাকলে তার নির্বাচিত আমীরের নিকটে বায়'আত না করলে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করতে হবে। এতদ্ব্যতীত ধর্মীয় উন্নতি ও অগ্রগতির সকল কাজে যোগ্য আমীরের অধীনে জামা'আত গঠন করে ইসলামী বা অনৈসলামী সমাজ বা রাষ্ট্রের মধ্যে ইসলামী দাওয়াত পরিচালনার অপরিহার্যতা বুঝানো হয়েছে বাকী হাদীছগুলিতে।

উপরোক্ত হাদীছ সমূহে মুসলিম উম্মাহকে কুরআন ও সুন্নাহ্র অনুশাসন মোতাবেক সুশৃংখলভাবে সামাজিক জীবন পরিচালনার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

আমরা বিশ্বাস করি যে, প্রতিটি গ্রাম বা মহল্লায় যখন একদল সৎসাহসী মুজাহিদ তরুণ আল্লাহকে রাযী-খুশী করার জন্য ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধে ঐক্যবদ্ধ হবেন এবং সমাজের সকল কল্যাণ কর্মে নিজেদেরকে নিয়োজিত করবেন, তখন সংখ্যায় যত কমই হৌক না কেন আল্লাহ্র সাহায্য নিয়ে তারাই জয়লাভ করবেন।

বস্তুতঃপক্ষে এটাই হ'ল 'জিহাদ'। আর এর মাধ্যমেই আসে কাংখিত 'সমাজ বিপ্লব'।

সমাজে চিরকাল বাতিলপন্থীর সংখ্যা বেশী ছিল, আজও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। তাই অধিকাংশ বাতিলের ভোট নিয়ে হক প্রতিষ্ঠা করা বিলাসী কল্পনা

১৬. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৬৬১।

১৭. তিরমিযী, মিশকাত হা/৩৬৯৪ হারেছ আল-আশ'আরী (রাঃ) হ'তে সনদ ছহীহ।

১৮. তিরমিযী, মিশকাত হা/১৭৩; ছহীহুল জামে' হা/৮০৬৫।

ছাড়া কিছুই নয়। নবীগণ কখনোই এপথে যাননি। তাঁদের পথ ছিল দাওয়াত ও জিহাদের পথ, নছীহত ও প্রতিরোধের পথ। নবীগণ সমাজের সংখ্যালঘু হকপন্থীদের খুঁজে বের করে তাদেরকে আল্লাহ্‌র নামে সংঘবদ্ধ করেছিলেন। তাঁদের মাধ্যমেই এসেছিল সমাজের আমূল পরিবর্তন। আজও সেই পথ ধরে এগোতে হবে; অন্যদের শিখানো পথ ধরে নয়।

আধুনিক রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক প্রশাসন যদি কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিরোধী হয়, তবে তা একটি ত্বাগূত ছাড়া কিছুই নয়। মুমিন কখনোই ত্বাগূত দ্বারা শাসিত হ'তে পারে না। সে কোন অবস্থাতেই ত্বাগূতের নিকটে তার বিচার-ফায়ছালার দায়িত্ব অর্পণ করতে পারে না *(নিসা ৪/৬০,৬৫)*। ঐ ত্বাগূতী সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্য মুমিনকে তাই সর্বদা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়। এজন্য তাকে সর্বদা রাসূলের দেখানো পথে চলতে হয়। কিন্তু এ পথে কাফির-মুশরিকদের চেয়ে মুনাফিকরাই সবচেয়ে বড় বাধা। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُوْلِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْكَ صُدُوْدًا- (النساء ٦١)-

'যখন তাদেরকে বলা হয় আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার দিকে এবং রাসূলের দিকে তোমরা ফিরে এসো, তখন আপনি মুনাফিকদের দেখবেন যে তারা আপনার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে (অর্থাৎ তারাই প্রথমে পথরোধ করে দাঁড়াবে)' *(নিসা ৪/৬১)*।

বলা বাহুল্য এই রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অপশক্তির বিরুদ্ধে উত্থান করতে গিয়েই উপমহাদেশে সৃষ্টি হয়েছিল সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভী (১২০১-১২৪৬হিঃ/১৭৮৬-১৮৩১খৃঃ) ও আল্লামা ইসমাঈল শহীদের (১১৯৩-১২৪৬হিঃ/১৭৭৯-১৮৩১খৃঃ) আলোড়ন সৃষ্টিকারী 'জিহাদ আন্দোলন', মাওলানা সৈয়দ নিছার আলী তীতুমীরের (১১৯৭-১২৪৬হিঃ/১৭৮২-১৮৩১খৃঃ) 'মোহাম্মাদী আন্দোলন', হাজী শরী'আতুল্লাহ্‌র (১১৯৬-১২৫৬হিঃ/১৭৮১-১৮৪০খৃঃ) 'ফারায়েযী আন্দোলন' প্রভৃতি। সমস্ত দেশকে বা সমস্ত মুসলিম সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করার দুঃস্বপ্ন তাঁরা দেখেননি কিংবা প্রতিষ্ঠিত বাতিল শক্তিকে উৎখাত করতে পারবেন এ অবাস্তব চিন্তাও তাঁরা করেননি। দুনিয়াবী নেতৃত্ব বা কর্তৃত্ব লাভের মোহও তাঁদের ছিল না। বরং যে কয়জন আল্লাহ্‌র পাগল নিবেদিত প্রাণ ভাইকে তাঁরা সাথে পেয়েছিলেন, সেই কয়জন মর্দে মুজাহিদকে নিয়ে তাঁরা স্বীয় যুগের ত্বাগূতী

শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেছিলেন। তাঁরা 'আমর বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকার'-এর দায়িত্ব পালন করেছিলেন মাত্র। ফলাফল আল্লাহ্র হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন। আজও আমরা সেটাই চাই।

আমাদের হৃদয়ের কান্না হ'ল এদেশে ইসলাম তার হারানো ঐতিহ্য ফিরে পাক। বাংলার ব্যক্তি ও সমাজ জীবন পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে গড়ে উঠুক। যালেম নিরত হৌক, মযলূমের মুখে অনাবিল হাসি ফুটে উঠুক। আসুন! আমরা আমাদের ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী গড়ে তুলি। সমাজের অন্যান্য ভাইকে নিরন্তর দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে ফিরিয়ে আনি এবং যেখানেই থাকি জীবনের সর্বক্ষেত্রে কিতাব ও সুন্নাতের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ্র নামে জান ও মাল দিয়ে সর্বাত্মক জিহাদে অবতীর্ণ হই। আল্লাহ বলেন,

انْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالاً وَجَاهِدُوْا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ– (التوبة ٤١)–

'তোমরা তরুণ ও বৃদ্ধ সকল অবস্থায় বেরিয়ে পড় এবং তোমাদের মাল ও জান দ্বারা আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ কর। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম পন্থা, যদি তোমরা বুঝ' *(তাওবাহ ৯/৪১)*। এই আয়াত পাঠ করে ছাহাবী আবু ত্বালহা (রাঃ) তাঁর ছেলেদেরকে বললেন, আমাকে জিহাদে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দাও। যুবক ছেলেরা বলল- আপনি আল্লাহ্র রাসূলের সাথে, তারপর আবুবকরের সাথে, তারপর ওমরের যুগে তাঁর সাথে জিহাদে গিয়েছেন। এখন তাঁরা সবাই মৃত। আপনি নিরত হৌন, আমরাই আপনার পক্ষ হ'তে যুদ্ধে যাব। পিতা আবু ত্বালহা ছেলেদের এই প্রস্তাব অস্বীকার করলেন। অতঃপর তিনি যুদ্ধে গিয়ে মারা গেলেন। সাগরে নয় দিন লাশ ভাসতে ভাসতে অবশেষে এক দ্বীপে গিয়ে ঠেকলে সাথীরা তাকে সেখানেই দাফন করলেন।[১৯]

আল্লাহ বলেন,

لاَ يَسْتَوِي الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِي سَبِيْلِ اللهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ، فَضَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِيْنَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ

---

১৯. *ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা তওবা ৪১।*

دَرَجَةً، وَكُلاًّ وَعَدَ اللهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِيْنَ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ أَجْرًا عَظِيْمًا- (النساء ٩٥)-

'অক্ষম ব্যতীত গৃহে উপবিষ্ট মুমিনগণ সমান নয় ঐসব মুজাহিদগণের, যারা তাদের মাল ও জান নিয়ে আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করে। আল্লাহ মুজাহিদগণের সম্মান ঐসব উপবিষ্টদের উপরে বৃদ্ধি করেছেন এবং প্রত্যেকের সাথেই আল্লাহ কল্যাণের ওয়াদা করেছেন। আল্লাহ উপবিষ্টদের উপরে মুজাহিদগণকে মহান প্রতিদানে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন' *(নিসা ৪/৯৫)*। অর্থাৎ জিহাদে যেতে আগ্রহী অক্ষম উপবিষ্টগণ যেমন অন্ধ, খঞ্জ, রোগী প্রভৃতি এবং জিহাদে গমন কারীগণ উভয়ের সাথেই কল্যাণের ওয়াদা রয়েছে।

আল্লাহ্‌র চূড়ান্ত ঘোষণা শ্রবণ করুন,

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِيْنَ- (آل عمران ١٤٢)-

'তোমরা কি ভেবেছ জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ আল্লাহ এখনও প্রমাণ জানতে পারেননি, কে তোমাদের মধ্যে সত্যিকারের মুজাহিদ ও কে সত্যিকারের দৃঢ়চিত্ত?' *(আলে ইমরান ৩/১৪২)*।[২০]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, কোন্ জিহাদ সর্বোত্তম? তিনি বললেন, 'যে ব্যক্তি মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে তার মাল ও জান দ্বারা'।[২১]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

وَعَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : جَاهِدُوا الْمُشْرِكِيْنَ بِأَمْوَالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ وَ أَلْسِنَتِكُمْ، رواه أبوداؤد والنسائى والدارمى بإسناد صحيح-

'তোমরা জিহাদ কর মুশরিকদের বিরুদ্ধে তোমাদের মাল দ্বারা, জান দ্বারা ও যবান দ্বারা' ('যবান' অর্থ কথা ও কলম)।[২২]

---

২০. *একই মর্মে তাওবাহ ১৬, মুহাম্মাদ ৩১।*

২১. *আবুদাঊদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত-আলবানী হা/৩৮৩৩ 'জিহাদ' অধ্যায়।*

২২. *আবুদাঊদ, নাসাঈ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৩৮২১।*

তিনি আরো এরশাদ করেন,

وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ مَّاتَ وَ لَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِّنْ نِفَاقٍ، رواه مسلم–

'যে ব্যক্তি মারা গেল অথচ জিহাদ করল না কিংবা অন্তরের মধ্যে কখনও জিহাদের কথাও আনলো না; সে এক ধরনের মুনাফেকীর হালতে মৃত্যু বরণ করল'।[২৩]

তিনি এরশাদ করেন,

وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تَــزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِىْ يُقَاتِلُوْنَ عَلى الْحَقِّ ظَاهِرِيْنَ عَلى مَنْ نَاوَأَهُمْ حَتَّى يُقَاتِلَ آخِرُهُمُ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ، رواه أبوداؤد–

'আমার উম্মতের মধ্যে একটা দল থাকবে যারা হক-এর পথে সংগ্রাম করবে। তারা শত্রু পক্ষের উপরে জয়লাভ করবে। তাদের সর্বশেষ দলটি দাজ্জালের সঙ্গে লড়াই করবে'।[২৪]

আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর সেই হকপন্থী মুজাহিদ দলটির অন্তর্ভুক্ত করুন এবং আমাদেরকে সর্বদা দাওয়াত ও জিহাদের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করার তাওফীক দান করুন- আমীন ইয়া রব্বাল 'আলামীন।

উপসংহার

১৯৮৬ সালের ২২শে অক্টোবরে রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র তিনদিন ব্যাপী কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য সম্মেলন উদ্বোধন করতে গিয়ে আমরা সমাজ বিপ্লবের তিনটি ধারার উপরে আলোচনার সাথে সাথে এ দেশে প্রচলিত তিনটি মতবাদ সম্পর্কে সকলকে হুঁশিয়ার করেছিলাম। জানিনা বিগত সোয়া চার বছরে আমরা এ ব্যাপারে কতটুকু এগোতে পেরেছি। তবে গত ১৯৮৯ ও ৯০-এর পৌনে দু'বছরে আমাদের উপর দিয়ে ঈমানের যে পরীক্ষা চলেছে, তাতে অনেক সামনের কর্মী পিছনে গিয়েছেন, অনেক পিছনের কর্মী সামনে এসেছেন। কেউবা ছিটকে পড়েছেন। সমাজ বিপ্লবের আদর্শে অনুপ্রাণিত কর্মীগণ এটিকে

২৩. *মুসলিম, মিশকাত হা/৩৮১৩ 'জিহাদ' অধ্যায়।*

২৪. *আবুদাউদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৩৮১৯।*

পরীক্ষার ক্রান্তি কাল হিসাবে গণ্য করেন এবং সমাজ পরিবর্তনের স্থির লক্ষ্যে চলার পথে এগুলিকে এক একটি বাধা বা পরীক্ষা বলে বিশ্বাস করেন। সমাজ বিপ্লবের জন্য আমরা সেদিন দু'টি বিষয়কে আবশ্যিক পূর্বশর্ত হিসাবে নির্ধারণ করেছিলাম।-

১- আক্বীদায় বিপ্লব আনা ২- নির্ভেজাল তাওহীদী আক্বীদায় বিশ্বাসী নিবেদিত প্রাণ বিপ্লবী কর্মীদের একটি জামা'আত গঠন করা। প্রথমোক্ত বিষয়টির সহজ সরল ব্যাখ্যা হ'ল মুসলিম হিসাবে আমাদের জীবনের সকল দিক ও বিভাগ কেবলমাত্র আল্লাহ্র বিধান মোতাবেক হবে, ত্বাগূতের বিধান অনুযায়ী নয়, এ আক্বীদা দৃঢ়ভাবে পোষণ করা। জীবনের একটি দিক অহি-র বিধান মোতাবেক হবে, আরেকটি দিক ত্বাগূতী মতবাদ অনুযায়ী হবে, এই দ্বিমুখী আক্বীদা ডাষ্টবিনে ছুঁড়ে ফেলতে হবে। এই নির্ভেজাল ঈমান ও আক্বীদাকে দুনিয়াবী স্বার্থের বিনিময়ে বিক্রি করা চলবে না। মসজিদে ছালাত আদায়ের সময়ে যেমন আমরা ছহীহ হাদীছের সঙ্গে কোন মাযহাবী ফিক্বহের আপোষ করি না, রাজনীতির ময়দানে তেমনি আমরা পাশ্চাত্যের শেরেকী গণতন্ত্র ও অন্যান্য মন্ত্রতন্ত্রের সঙ্গে আপোষ করতে পারি না। আপোষ করতে পারি না অর্থনীতির ময়দানে ধিকৃত পুঁজিবাদ ও সমাজবাদের সাথে। **আমরা নির্ভেজাল ইসলামী রাজনীতি চাই, রাজনৈতিক ইসলাম নয়। আমরা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নির্ভেজাল ইসলাম চাই, মিশ্রিত ইসলাম নয়।** বিভিন্ন শেরেকী ও বিদ'আতী রসম-রেওয়াজে অভ্যস্ত বর্তমান মুসলিম সমাজ ও সরকার ইসলামের যে অংশটুকু পালনে বাধা দেয়, সেটুকু আমরা পালন করি না, কিংবা অজুহাত দিয়ে বাঁচবার চেষ্টা করি। অথচ ইসলামের দাবী ছিল সমাজ ও সরকারের নিকটে আমরা আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও আক্বীদাকে বিকিয়ে দেব না। আমরা আমাদের দ্বীনী ও দুনিয়াবী জীবনের জন্য দু'জন রাসূল দাবী করতে পারি না। বরং জীবনের সকল দিক ও বিভাগের জন্য মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কেই আমরা আমাদের একমাত্র নবী ও হা-দী হিসাবে বিশ্বাস করি। যে সমাজ বা সংগঠন বা সরকার আমাদের ইসলামী আক্বীদা অনুযায়ী আমল করতে বাধা দেয়, তার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক জিহাদে জান-মাল উৎসর্গ করাই মুসলিম জীবনের চূড়ান্ত কর্তব্য বলে আমরা মনে করি।

দ্বিতীয় বিষয়টি সম্পর্কে বলা চলে যে, চিরকাল অল্পসংখ্যক যোগ্য ও নিবেদিতপ্রাণ লোকের দ্বারাই অধিক সংখ্যক লোক পরিচালিত হয়েছে। ঐ নিবেদিতপ্রাণ লোকগুলি যখন বাতিলপন্থী হয়, তখন সমাজে বাতিল প্রতিষ্ঠিত

হয়। বাকী ৯৫ শতাংশ লোক ইচ্ছায় অনিচ্ছায় তাদের অনুসারী হয়। আর যখন তারা হকপন্থী হয়, তখন সমাজে হক প্রতিষ্ঠিত হয়। বলা বাহুল্য 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ও 'আহলেহাদীছ মহিলাসংস্থা' প্রতিষ্ঠার মূলে আমাদের মূল প্রেরণা ছিল এটাই। এর বাইরে আমরা তখন কিছু জানতাম না। আজও জানিনা। জানিনা বিগত কয়েক বৎসরের চেষ্টায় আমরা কতজন বিপ্লবী কর্মী সৃষ্টি করতে পেরেছি। তবে আমাদের আন্দোলন যে ইতিমধ্যে বাতিলের হৃদয়ে দুরু দুরু কম্পনের সৃষ্টি করেছে, তা বেশ স্পষ্ট হয়ে গেছে। এতদিন বাইরের হুমকি মুকাবিলা করছিলাম, এখন আভ্যন্তরীণ হিংসার মুকাবিলা করতে হচ্ছে। ১৯৪৯ সালে এই নওদাপাড়াতে অনুষ্ঠিত 'নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলেহাদীছ' কনফারেন্সে আহলেহাদীছ আন্দোলনের অকুতোভয় সেনানী মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী (১৯০০-১৯৬০খৃঃ) তাঁর ভাষণে বলেছিলেন, 'বর্তমানে আহলেহাদীছ আন্দোলন আন্দোলনের পরিবর্তে একটি ফির্কায় পরিণত হয়েছে। এই জামা'আতের যে কিছু করণীয় আছে বা এর অস্তিত্বের যে কোন প্রয়োজন আছে, তা অনুমান করাও কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে'[২৫]। তিনি বলেন, 'আহলেহাদীছ নামধারী আমাদের অনেক বন্ধুর এ আন্দোলন সম্বন্ধে ধারণা একান্ত অস্পষ্ট ও ধুম্রাচ্ছন্ন-তন্দ্রাবিজড়িতের স্বপ্নবৎ। কেউ কেউ এ আন্দোলনের মূলনীতিতেই বিশ্বাস করেন না। কেউ কেউ আমাদের পূর্বপুরুষদের রক্তসিঞ্চিত এই আমানতের নাম ভাঙিয়ে খাচ্ছেন। আমাদের মধ্যে কর্মবিমুখতা ও দায়িত্বহীনতার সঙ্গে তাক্বলীদ ও দলবন্দীর অভিশাপ প্রবেশ করেছে'।[২৬] মাওলানার অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ এই বাস্তব ও তিক্ত সত্য কথাগুলি অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করার জন্য আমরা সকল পর্যায়ের আহলেহাদীছগণের নিকটে আকুল আবেদন জানাচ্ছি।

পরিশেষে আমি বাংলাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনের সার্বিক অগ্রগতি ও আজকের সম্মেলনের সার্বিক সফলতার জন্য আল্লাহ্র তাওফীক প্রার্থনা করে আল্লাহ্র নামে এই মহতী জাতীয় সম্মেলন'৯১ ও তাবলীগী ইজতেমার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

---

২৫ ও ২৬. *আহলেহাদীস পরিচিতি (ঢাকা: ৯৮ নওয়াবপুর রোড, ২য় সংস্করণ ১৯৮৩ ইং), পৃঃ ৯৭ ও ১০৫।*